ভুল করাই মনুষ্যপ্রকৃতি। সকল অপূর্ণ জীবের পক্ষে ভুল অনিবার্য্য। কিন্তু কেহই অপূর্ণ থাকতে চায় না। সকল জীবেই এমন এক উপাদান বর্ত্তমান, যার জন্য সকলেই পূর্ণতার প্রতি আগ্রহশীল। তা যদি না হোত, তা'হলে আমরা আদৌ কোন অভাব বোধ করতে পারতাম না। কিন্তু ঐ আগ্রহ খুবই ক্ষীণ এবং সীমিত। তা নাহলে অচিরাৎ পূর্ণতার লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে যেতাম। সুতরাং মনুষ্য জীবনে সীমাবদ্ধ সক্ষমতার জন্য প্রকৃত পরিচালক বা গুরুর প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর
দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীনবদ্বীপধাম

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-কেশরী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
প্রিয়তম পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের
শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস বিশ্বপ্রচারক
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের
তত্ত্বাবধানে

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীপাদ ভক্তিকমল ত্যাগী মহারাজ

অলঙ্করণ ঃ
শ্রীমহামন্ত্র দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ
পঞ্চশত শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসর খৃষ্টাব্দ ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসর গৌরাব্দ ৫০৪, খৃষ্টাব্দ ১৯৮৯

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসর গৌরাব্দ ৫২৮ খৃষ্টাব্দ ২০১৩

মুদ্রণ ঃ
সি.ডি.সি. প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ রাধানাথ চৌধুরী রোড্
কোলকাতা ৭০০ ০১৫

সূচীপত্র

আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-তত্ত্ব ২৫
জীবের চরম প্রাপ্তি ৩৫
সমস্যা ও সমাধান ৪১
পরমার্থ লাভের পন্থা ৫৭
বন্ধন মুক্তির উপায় ৬৫
বৈষ্ণব জীবনে আনুগত্য ৭৫
ধর্ম্ম শিক্ষা ও বিশ্বাস ৮৭
শ্রীশরণাগতি. ৯১
জীবের স্বাধীন ইচ্ছার নিশ্চয়াত্মক স্বার্থকতা. ৯৯
সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কৃপাদর্শনেই প্রকৃত সুখ লাভ . . ১০৩
মানব জীবনের কর্ত্তব্য. ১০৯
ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় ১২৫
আগুন জ্বালো,
বাতাস আপনি আসবে ১৩৩
মা মুঞ্চ-পঞ্চ-দশকম্ ১৩৭

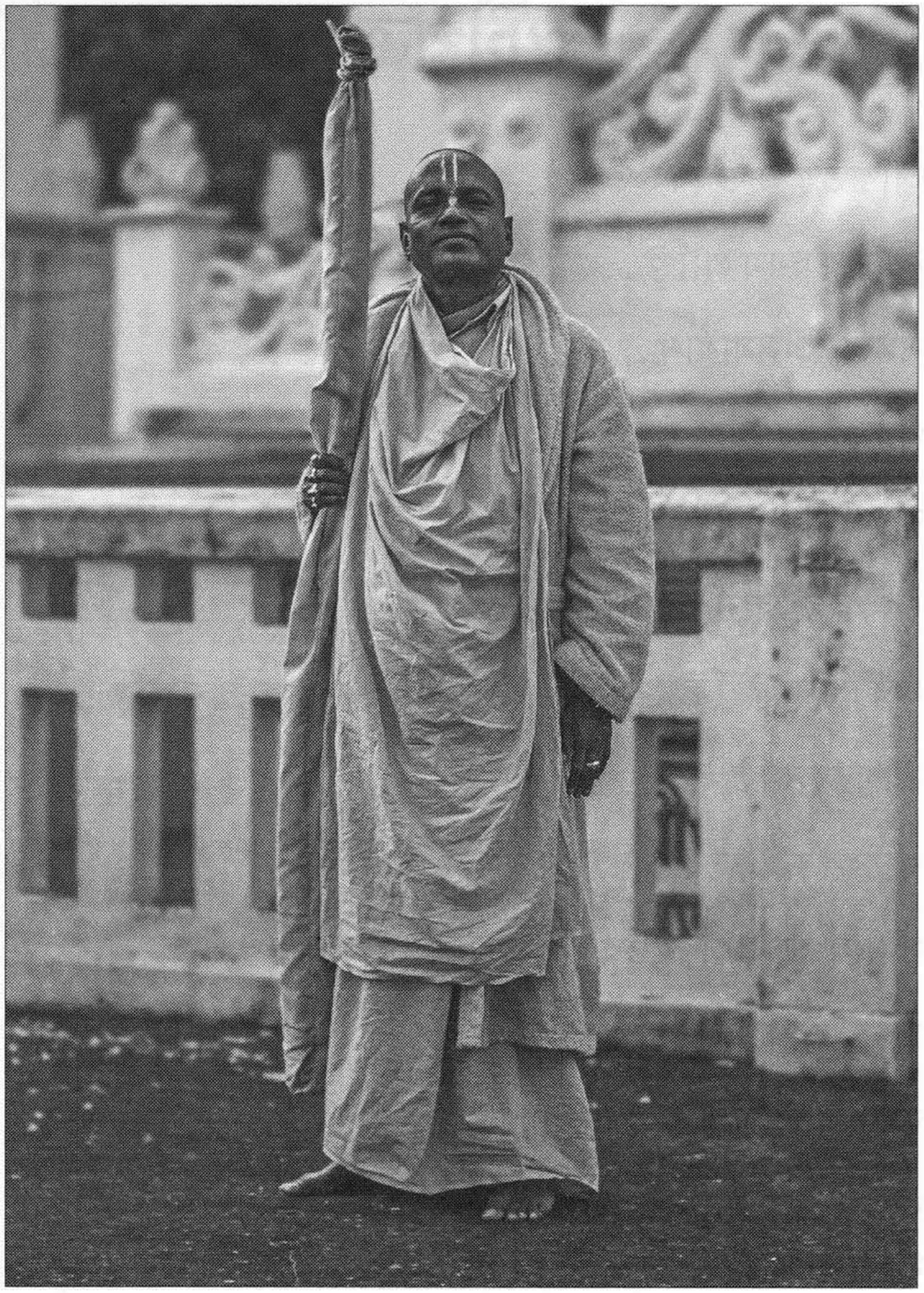

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

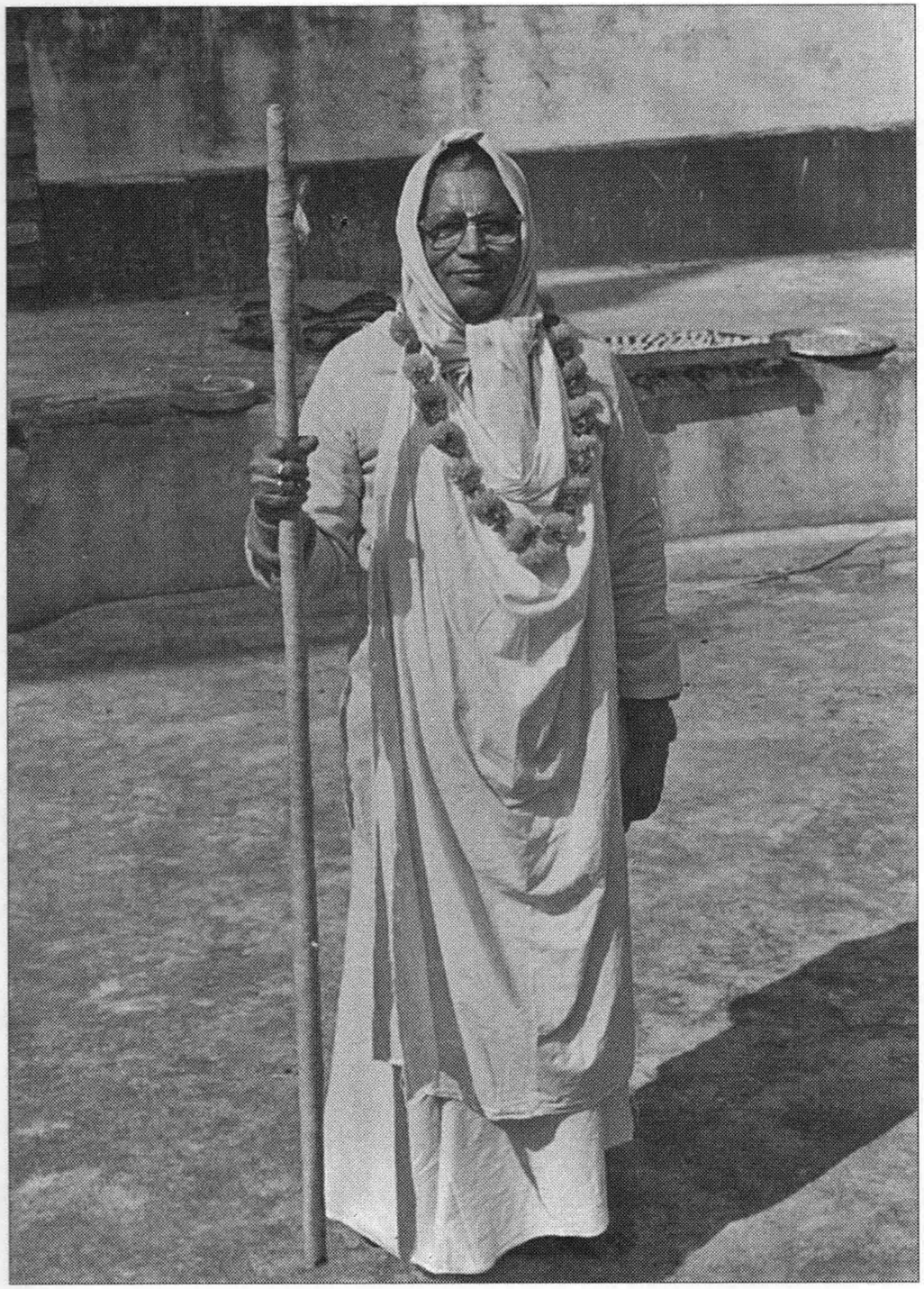

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

ভগবান্
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রণতি

শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাঙ্ঘ্রীন্ গণৈঃ সহ।
বন্দে প্রসাদতো যেষাং সর্ব্বারম্ভাঃ শুভঙ্করাঃ ॥

কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং সৌম্যমূর্ত্তিং
বিবুধকুলবরেণ্যং শ্রীগুরুং সিদ্ধিপূর্ত্তিং।
তরুণতপনবাসং ভক্তিদঞ্চিদ্বিলাসং
ভজ ভজ তু মনো রে! শ্রীধরং শম্বিধানম্ ॥

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিছিন্ন-কর্ত্রী
বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ॥

গুরুরূপহরিং গৌরং রাধারুচিরচাবৃতম।
নিত্যং নৌমি নবদ্বীপে নামকীর্ত্তন-নর্ত্তনৈঃ ॥

নম্র নিবেদন

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের অপ্রাকৃত হরিকথামৃতের কিছু অংশ বাংলা ভাষায় 'অমৃতবিদ্যা' নামে প্রকাশ পেয়েছিলেন সেটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় সেটিই এবারে আরো একটু বর্দ্ধিত কলেবরে 'শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত' এই নামে প্রকাশ পেতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথার বৈশিষ্ট্য ও মহিমা সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছা হলেও আপন অযোগ্যতার জন্য মনে ক্ষোভ নিয়ে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পরমপূজ্য বৈষ্ণববৃন্দের কৃপা প্রার্থনা করে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্পর্কে পূজনীয় গুরুবর্গ ও বৈষ্ণববৃন্দের কথাগুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের মুখপদ্ম-নিঃসৃত হরিকথামৃত, অতিলৌকিক প্রজ্ঞানপ্রতিভা, অমূল্য রচনারত্নাবলী, দিব্য মহাভাগবতীয় চরিত্রে বিচিত্র রাগমাধুরীতে রচিত হয়েছে আনন্দলীল ভগবানের অনুপম অখিলরসামৃত-রূপ। যে সকল শ্রদ্ধালু ভাগ্যবান সুমেধগণ এই শ্রীরূপানুগ আচার্য্যশ্রেষ্ঠের হরিকথামৃত শ্রবণে শ্রুতিকে নন্দিত করেছেন,

রচনা-সম্ভার পাঠ করে হৃদয়কে তৃপ্ত করেছেন তাঁরাই জানেন কি স্বাদু, শ্রীরূপানুগভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গভীর ভাব-অনুভূতিময় সেই প্রকাশ। তাঁরাই কোনো এক অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে স্বতোৎসারিত সমাদরে, প্রেরণায়, শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে আরাধ্য পাদপদ্মে নত হয়েছেন, ভালবেসেছেন তাঁকে। আমরা দেখেছি তাঁর মাঝে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-বিলাস-বৈভব লক্ষ্য করে তাঁর অনেক প্রিয় সতীর্থগণ তাঁকে কত প্রগাঢ় সমাদর করে, শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করে শিক্ষাগুরুর মহিমাময় সিংহাসনে বরণ করে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যবর্গ যেমন শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীল ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীল ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ প্রমুখ ভাগবতগণের শ্রীমুখ থেকে শ্রীল গুরুমহারাজ-সম্বন্ধীয় কিছু কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কখনও ভাষণে, কখনও একান্তে একাধিকবার তাঁদের বিবিধভাবে বলতে শুনেছি 'শ্রীল শ্রীধর মহারাজের হরিকথা শুনলে মনে হয় যেন শ্রীল প্রভুপাদের মুখ থেকে হরিকথা শুনেছি। ... শ্রীল শ্রীধর মহারাজের মধ্যে আমরা শুদ্ধ রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ধারা দেখতে পাই।' পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ গুরুমহারাজ সম্পর্কীয় বক্তৃতার মাঝে বলেন— "শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে শাস্ত্রনিপুণ শ্রীধর মহারাজ। 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' কীর্ত্তন গান করিয়ে প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে আত্মসাৎ করে গেলেন। ... শ্রীভক্তিরক্ষক

নামে ভূষিত করে প্রভুপাদ তাঁকে ভক্তির রক্ষণ, শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ ও পোষণের ভার দিয়ে গেলেন।" পরম অর্চ্চনীয় আচার্য্যভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহদশকম দেখে happy style বলে প্রশংসা করেছেন এবং উত্তরকালে সম্প্রদায় সেবার শুভেচ্ছা ও আশা প্রকাশ করেছিলেন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ ও তাঁর হরিকথা সম্পর্ক যে সব কথা লিখে রেখেছেন সেগুলি আজও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে তিনি লিখেছেন "পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের এক একটি বক্তৃতা এক একটি থিসিস্ তুল্য। আমি একবার তাঁহার গীতা সম্বন্ধে ভাষণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম।" এছাড়া শ্রীল গুরুমহারাজের ব্রহ্মগায়ত্রীর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য রচনাবলী শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন সেটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। আর এক জাগায় তিনি লিখেছেন "পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের নিত্য নব-নবায়মান ভাববৈচিত্র্যসহ হরিকথা কীর্ত্তন সত্যই অতীব হৃৎকর্ণরসায়ণ, শ্রদ্ধালু শুশ্রুষু মাত্রেই তাঁর কথামৃত পরিবেশন ভঙ্গীকে সর্ব্বোতভাবে সমাদর করিয়া থাকেন। ... আমাদের আরও আনন্দের বিষয় যে পাশ্চাত্যদেশের বহু সত্যানুসন্দিৎসু সজ্জন পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং

তাঁহার আনুগত্যে বিপুল উদ্যমে ভজন সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।" সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনা প্রচারকারী বিশ্বরেণ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের একটি ভাষণ এই গ্রন্থের প্রথমেই আছে, যাতে তিনি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে তাঁর শিক্ষা গুরুরূপে উল্লেখ করেছেন। পরমপূজ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল গুরু মহারাজের শ্লোকাদি রচনাসমূহকে শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচনার সঙ্গে অভিন্ন বলে মন্তব্য করেছেন। এমনি করে আরও অনেকেই তাঁর হরিকথার ও দিব্য ভজন জীবনের বহুল প্রশংসা করে গেছেন। শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁর অন্তলীলায় ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্যদেশাগত ভক্তবৃন্দকে যে কথামৃত দান করেছেন সেইগুলি আজ বেশ কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে জগৎজীবের অশেষ মঙ্গল বিধান করছে।

অযোগ্যতাবশতঃ এখানে সামান্য কিছু শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-নিঃসৃত হরিকথা তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। এই অভক্ত প্রয়াসে ভুল-ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-দেবগোস্বামী-বিষ্ণুপাদানাং
পরমহংসানাং চতুর্নবতিতম-শুভাবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি-দশকম্

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজরাজেশ্বরং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বামিনং সদা॥ ১॥

সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষুং পরং।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা-গোপীচন্দন-ভূষিতম্॥২॥

অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞানপ্রভাকরং।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্॥৩॥

গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তভং।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্॥৪॥

গায়ত্র্যর্থ-বিনির্য্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ গৌরবং।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্॥৫॥

অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্॥৬॥

সংকীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভং।
সংভাতি বিতরন্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ॥৭॥

ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে।
বিশ্ববিশ্রুত-শ্রীচৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্ ॥৮॥

স্থাপয়িত্বা গুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহান্।
প্রকাশয়তি চাত্মনং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ ॥৯॥

গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥১০॥

শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ॥১১॥

প্রণতি-দশকম্-এর মর্ম্মানুবাদ

আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যতিরাজ-রাজেশ্বর শ্রীল ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর স্বামীর শ্রীচরণ-কমল নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১॥

যিনি সুদীর্ঘ উন্নত দিব্যজ্যোতির্ম্ময় নয়নাভিরাম অতুলনীয় শ্রীঅঙ্গ-বিশিষ্ট, ত্রিদণ্ডধারী, তুলসীমালা ও গোপী-চন্দন-বিভুষিত, যিনি ধারণাতীত প্রতিভার অধিকারী হইয়াও পরমস্নেহময়, যিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, ব্রহ্মসম্মিত শ্রীভাগবত-পুরাণাদি-সর্ব্বশাস্ত্রের বাস্তব-সামঞ্জস্য বিধানকারী,

যিনি শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যরত্নমালায় সমুজ্বল কৌস্তভমণির ন্যায় শোভমান এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মহাপ্রেমে উন্মত্ত ভক্তভ্রমরগণের শিরোমণিরূপে বিরাজিত, আমি আমার সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২–৪॥

যিনি কৃপাপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ পূর্ণ-বিকশিত করিয়া এবং শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ-গৌরবময় গুপ্তধন ভাণ্ডার উদঘাটিত করিয়া আপামরকে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি ভক্ত-ভগবানের নানাবিধ স্তোত্র-রত্নাদি সমৃদ্ধ 'শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্' নামক গ্রন্থরাজ ও শ্রীভগবদ্-ভক্তগণের হৃদিন্দ্রিয় রসায়ন-স্বরূপ অপূর্ব্ব-গ্রন্থরাজি প্রকটিত করিয়া জগতকে প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই কারুণ্য-সুন্দর-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥৫–৬॥

যিনি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মহারাস-রসাব্ধি-সমুত্থিত চন্দ্রমা-স্বরূপ ভগবান শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে সমগ্রবিশ্বে সপার্ষদে বিতরণ করিতে করিতে সম্যকরূপে শোভা পাইতেছেন ॥৭॥

যিনি ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামের গুপ্ত-গোবর্দ্ধন-স্বরূপ অপরাধ-ভঞ্জনপাট শ্রীকোলদ্বীপে বিশ্ব-বিশ্রুত মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ স্থাপন ও তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর বিগ্রহগণের সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া স্বয়ং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ দয়িতরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর দিব্য-ধারা-ধর শ্রীল

ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৮–১০॥

যিনি প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সানন্দে এই প্রণতি-দশক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীল গুরুদেব নিজজনের কৃপা লাভ করিয়া রাগমার্গে ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন ॥১১॥

শ্রীগুরু আরতি-স্তুতি

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতি-রাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেবগোস্বামী শ্রীধর ॥১॥

পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি' ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে ॥২॥

তোমার করুণাঘন মুরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া ॥৩॥

সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥৪॥

সুবর্ণ-সুরজ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক, তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ ॥৫॥

অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নত-ভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল ॥৬॥

অচিন্ত্য প্রতিভা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান-গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার ॥৭॥

গৌর-সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
"দয়াল নিতাই" নামে নিত্য প্রেমময় ॥৮॥

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস ॥৯॥

গৌড়ীয়-আচার্য্য-গোষ্ঠী-গৌরব-ভাজন।
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তমণি কণ্ঠ-বিভূষণ ॥১০॥

গৌর-সরস্বতী-স্ফূর্ত্ত সিদ্ধান্তের খনি।
আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তামণি ॥১১॥

একতত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য-নবভাব।
সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব ॥১২॥

তোমার সতীর্থ-বর্গ সবে একমতে।
রূপ-সরস্বতী ধারা দেখেন তোমাতে ॥১৩॥

তুলসীমালিকা হস্তে শ্রীনাম-গ্রহণ।
দেখি' সকলের হয় 'প্রভু' উদ্দীপন ॥১৪॥

কোটীচন্দ্র-সুশীতল ওপদ ভরসা।
গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দলীলামৃত-লাভ-আশা ॥১৫॥

অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রকাশ।
সানন্দে আরতি স্তুতি করে দীন দাস ॥১৬॥

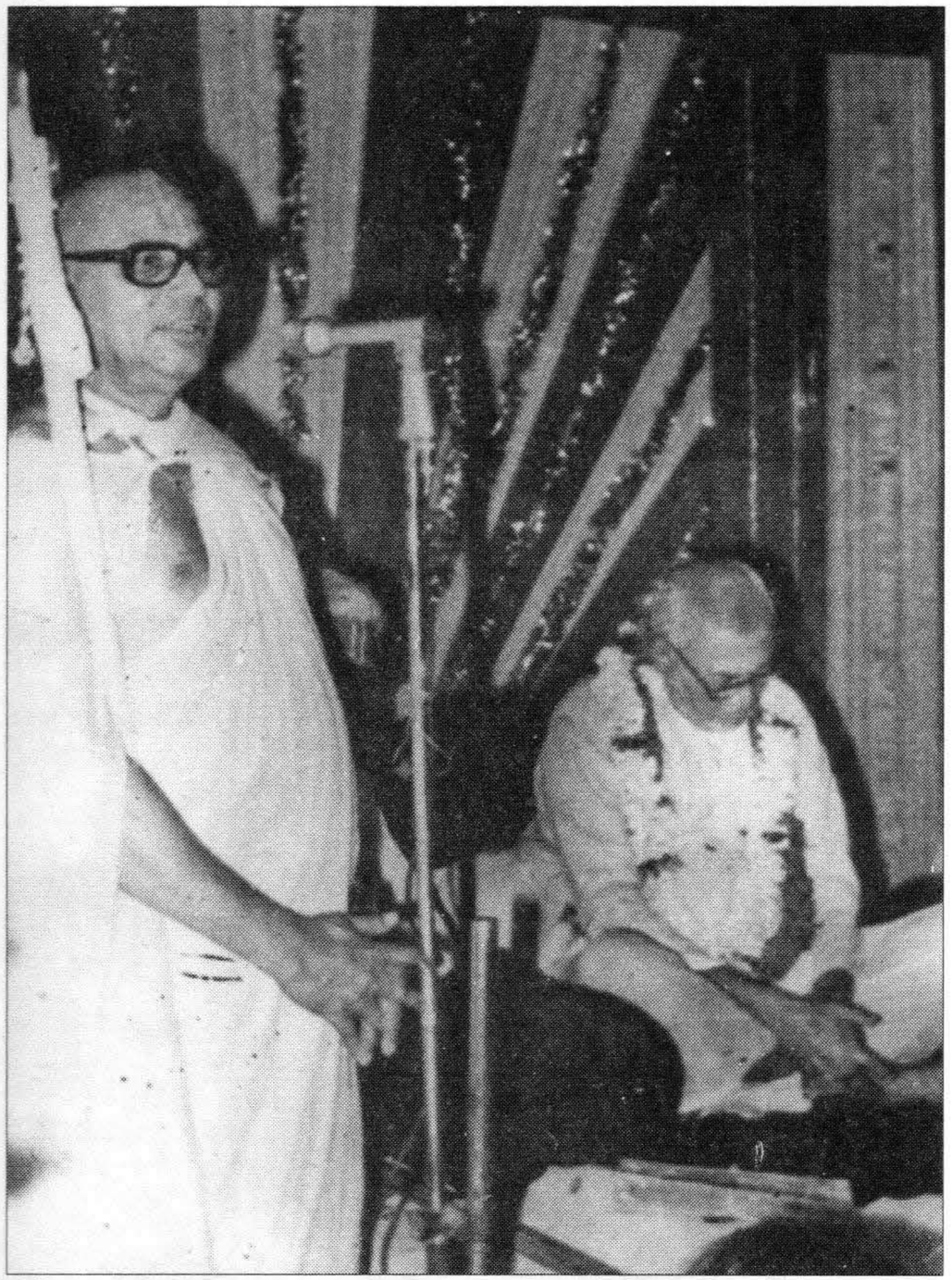

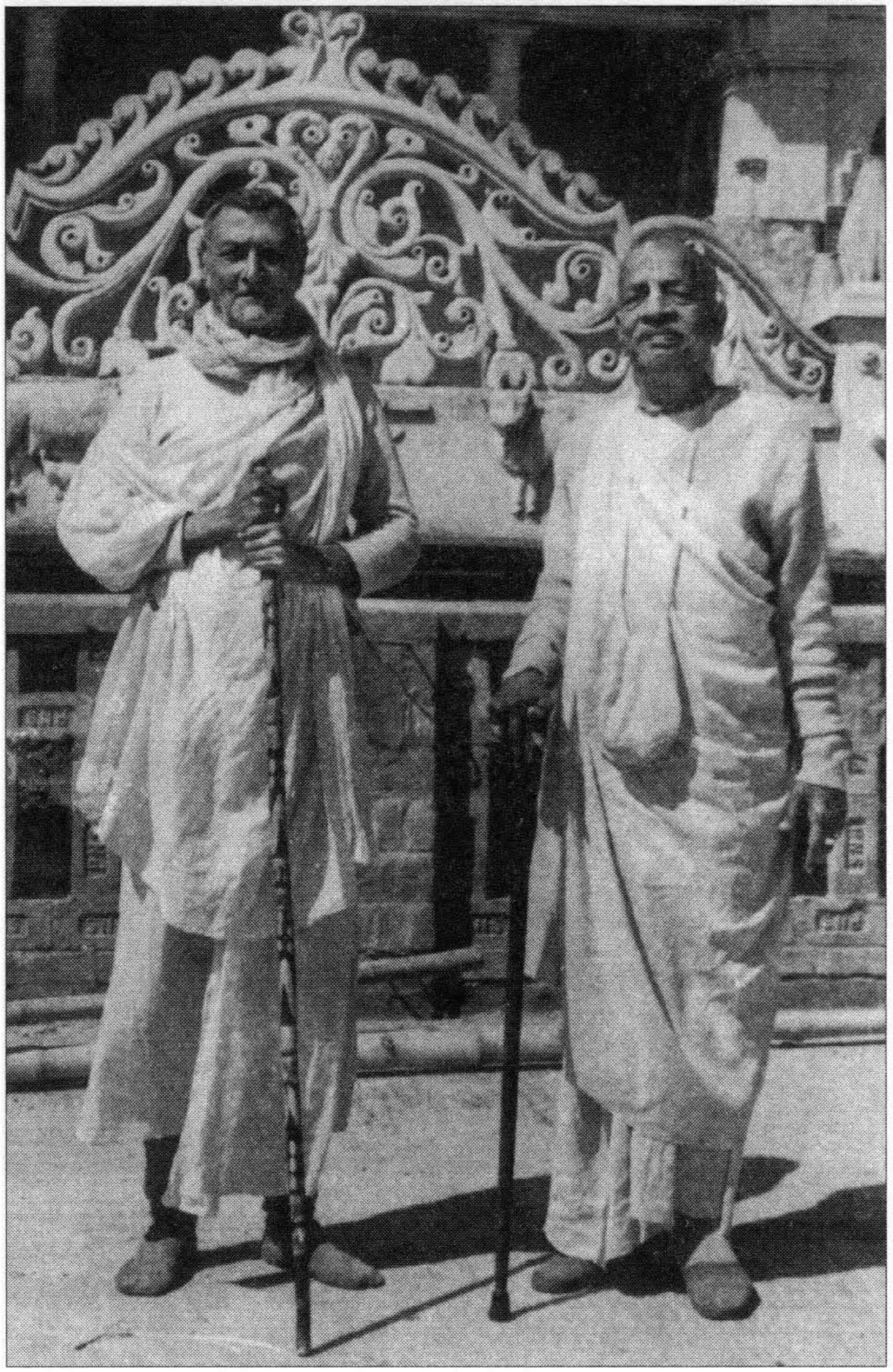

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য

শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের একটি ভাষণ—

আমরা পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখ নিঃস্বত ভাষণ শ্রবণ করে নিজেদের অতিশয় ভাগ্যবান বলে মনে করছি। বয়স এবং অভিজ্ঞতা উভয়দিক থেকেই তিনি আমার চেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক কাল আগে থেকে, সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি।সদ্য গৃহ পরিত্যাগ করে এসেছেন। তিনি এলাহাবাদে প্রচারে গিয়েছিলেন এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা পরস্পর মিলিত হয়েছিলাম।

শ্রীধর মহারাজ আমার বাড়ীতে বেশ কয়েক বছর বাস করেছিলেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গ কথাবার্ত্তা হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর এমন উচ্চস্তরের উপলব্ধি আছে যে, সাধারণ যে কেউ তা শুনলে মুর্চ্ছিত হয়ে যাবে। তিনি বরাবরই আমার শুভ পরামর্শদাতা এবং আমি তাঁর উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম; যেহেতু প্রথম থেকেই আমি জানতাম যে তিনি কৃষ্ণের একজন শুদ্ধ ভক্ত। সেজন্য আমি তাঁর সঙ্গ লাভ করতে

চেয়েছিলাম। কৃষ্ণ এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত তাঁকে পছন্দ করেছিলেন আমাকে প্রস্তুত করার জন্য। আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট।

আমাদের গুরু মহারাজের প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যাওয়ার পর শ্রীধর মহারাজকে প্রধান করে আমি আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মনস্থ করেছিলাম। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে সারা পৃথিবীতে শ্রীধর মহারাজ হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণীর সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য, সূক্ষ্মদর্শী প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমি তাঁকে সর্ব্বত্র নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। এটিই ছিল আমার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর যখন সারা বিশ্বে প্রচার করতে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, অন্ততঃ সারা বিশ্বের জনগণের তাঁর নিকট আসা উচিত—কিছু শোনার জন্য।

জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদের নিশ্চয়ই এমন একজনের কাছে যাওয়া উচিত যিনি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ অনুশীলন করেছেন। সুতরাং কেউ যদি সত্য সত্যই শিক্ষাগুরুর নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী হয় তাহলে তার ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ থেকে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এমন কি আমি নিজে শ্রীধর মহারাজকে আমার শিক্ষাগুরু বলে মনে করি। সুতরাং অন্যান্যরা যে তাঁর সঙ্গলাভ থেকে উপকৃত হবেন তাতে আর বলার কি থাকতে পারে।

গৌড়-দেশীয় সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বানুভবের মানদণ্ড বলিতে যাহা গৌড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসাশ্রমে উদিত হইয়াছে; উহাই গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে উদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ করুণালোক সঞ্চারিত ও বিতরিত হইয়া জগৎজীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছে। ইহাই সমগ্র আর্য্যভূমির বা ভারতের প্রাপ্তি বা সংসিদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদাময় দানের সর্ব্বোত্তম পদার্থ।

—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

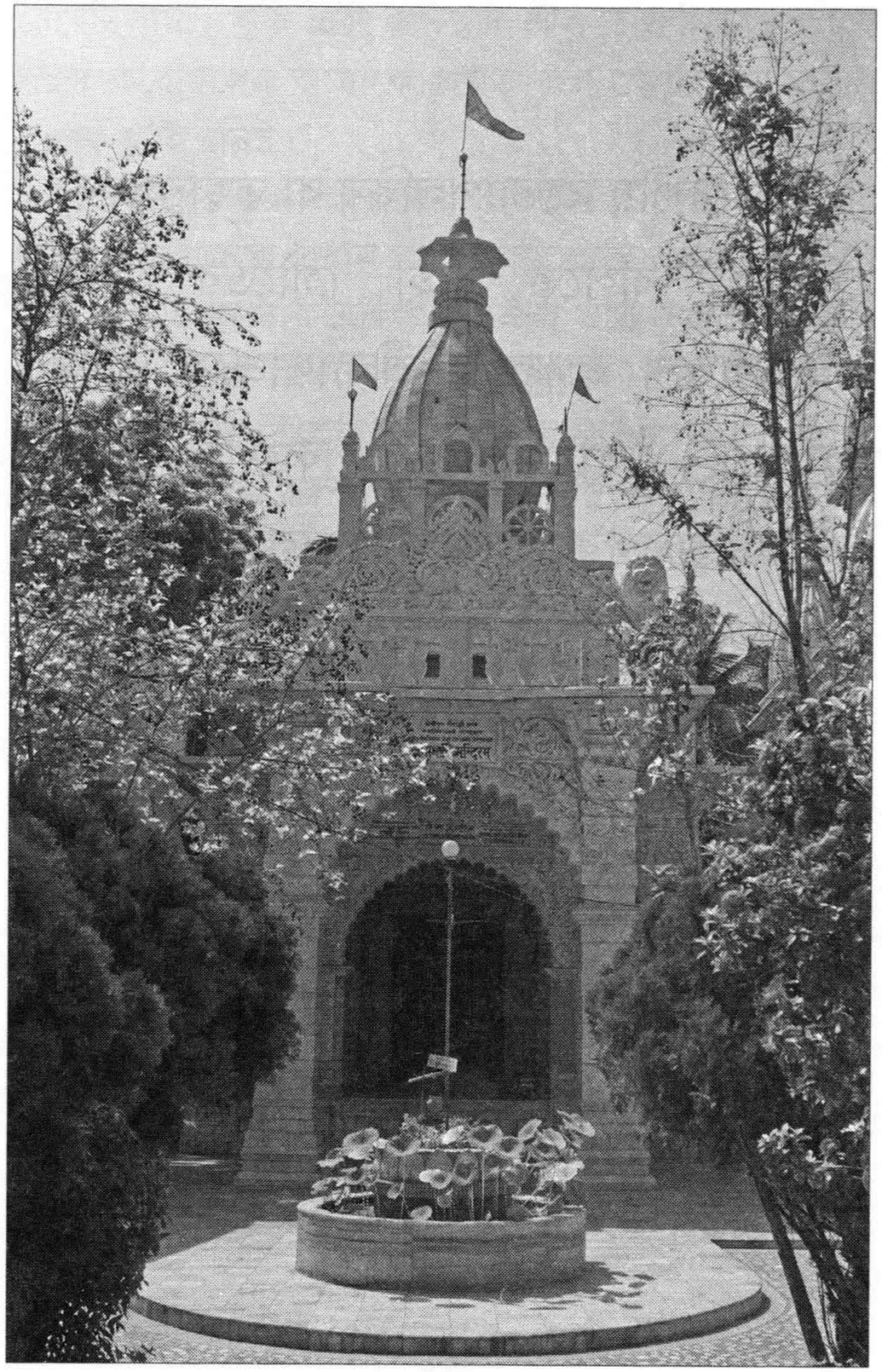

আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-তত্ত্ব

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।

(গীতা ৩।৪২)

'—পণ্ডিতগণ বলেন জীবদেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা—ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষাও নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই জীবাত্মা। এজগতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ চোখ, কান, নাক এগুলি খুব 'Important' (প্রয়োজনীয়) এগুলি যদি কেড়ে নেওয়া যায় তাহলে আমাদের কিছুই নাই, কেননা চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শুনা যায়; এভাবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, এগুলি না থাকলে কোন কিছু আমাদের আস্বাদনীয় হবে না। তারপর ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ'—ইন্দ্রিয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মন। কেন? যদি আমরা অন্যমনস্ক থাকি তাহলে শুনতেও পাইনা দেখতেও পাই না। তাহলে ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন বড় বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়। মনের ধর্ম্ম কি—সংকল্প বিকল্প, অর্থাৎ এইটে চাই এইটে চাইনে, এই যে ভাব এটাই হল মনের ধর্ম্ম। তারপর

'মনসস্তু পরা বুদ্ধি' —মনের উপরে হচ্ছে বুদ্ধি, 'Judging faculty', বুদ্ধি বলে দেয় এইটে নাও, এইটে নিওনা, এইটে ভাল, এইটে ভাল নয় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বিচার দেওয়া বুদ্ধি কাজ। সুতরাং 'Intelligence' বা 'Judging faculty' যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে তা আরো 'important' (প্রয়োজনীয়) সেই ইন্দ্রিয় অথবা মন থেকে। আর 'বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ' — এখন বুদ্ধি হতে আর এক ডিগ্রি উপরে গেলে দেখা যাবে 'Our real self' অর্থাৎ আমাদের মূল সত্ত্বা সেখানে। সেটা কি, সেটা একটা আলোর কণার মত। আলোটা পড়লে পরে বুদ্ধি বলে দেয় এটা কালো, এটা সাদা, এটা ভাল, এটা মন্দ। তাহলে ইন্দ্রিয় দেখিয়ে দেবে, মন চাইবে, বুদ্ধি বিচার করবে, কিন্তু আলোটা তো চাই, 'Light' জ্ঞান। তাহলে জ্ঞানের কণা হচ্ছে আত্মা, আর তারও উপরে হচ্ছে গিয়ে পরমাত্মা যা আরো সুসূক্ষ্ম। আত্মাতো 'Partial' (অংশ) কিন্তু পরমাত্মা আরো ব্যাপক সে একে 'Control' (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি ফেরালে আরো উচ্চতর জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলক এভাবে আছে। গোলোকে ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি। সেখানে যেতে হলে মালিক হয়ে যেতে পারবে না, প্রভু হয়ে যেতে পারবে না, চাকর হয়ে যেতে হবে। কেননা সেখানকার 'Soil' তুমি যে উপাদানে তৈরী তার চেয়েও দামী উপাদানের 'Soil' সেটা। 'বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকলই চিন্ময়' (চৈঃ চঃ)। বৈকুণ্ঠ যাকে বলা হয়েছে জীবাত্মার উর্দ্ধতম দেশ, মানে সূক্ষ্মতম দেশ,

সে দেশ চিন্ময় দেশ, 'মায়িক ভূতের তথা জন্ম নাহি হয়'। সেখানকার জলবায়ু সকলই চেতন। স্থূল উপাদানে তৈরী নয়, 'Matter' দিয়ে তৈরী নয়। জীব যে 'Conscious' এ আছে তার চেয়ে 'Higher Consciousness' সেখানে আছে। তাঁরা এখানে আসতে পারেন কিন্তু জীব 'Objective Position'-এ আছে। জীব পরাধীন তাই সে 'Slave' হয়ে যেতে পারে, তাই মহাপ্রভু বললেন, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' অস্বীকার করলে চলবে না। তুমি চেতনের কণা, জগতে তোমার Position' কতটুকু হতে পারে। কেন্দ্রের তুলনায় 'Absolute'-এর কাছে তুমি সামান্য সুতরাং সেই সত্য সম্বন্ধটা স্বীকার করে নিলে ভাল হয় না ? যে তুমি বড় আমি ছোট। এ সত্যটা স্বীকার করলে তুমিতো একটা 'Place' (স্থান) পাও, তা না হলে মায়া এদিকটা তো মায়া, যা মহামিথ্যা। রবিঠাকুরের একটা নাটকের শেষে বলা হয়েছে তুমি মহামায়া, তুমি মহামিথ্যা। এখানকার যা ভোগ সবই মিথ্যা। 'মা' মানে 'না' অর্থাৎ 'যা নয়'। সেটা 'Separate Provincial interest' (পৃথক ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বার্থ)। একটা 'Universal wave' (অনন্তের প্রবাহ) চলছে তাতে আমরা আমাদের 'Separate interest' এর 'Wave' (পৃথক স্বার্থের তরঙ্গ) তুলে এটিকে ব্যাহত করতে চাই, প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ পরিচয়কে দেখতে চাই। যেমন একটা নিম গাছ, আমরা বলব এর থেকে ঔষধ ইত্যাদি হয়, আর পোকা বলবে, আমাদের বংশানুক্রমে 'Record' (সংগৃহীত তথ্য) হচ্ছে ওটা খুবই নোংরা, বাজে

ওটা আমরা খেতে পারিনা। এভাবে প্রত্যেকে নিজের সম্বন্ধ অনুসারে বিচার করবে। আমরা একটা ঘর করলাম তাতে পায়রারা বলছে আমার জন্য ঘর এই বলে জায়গার জন্য পরস্পর ঝগড়া করছে।

এই রকম ভাবেতে একটা 'Universal' (পরিপূর্ণ) লক্ষ্য নিয়ে একটা 'Wave' (তরঙ্গ) চলছে বা লীলা চলছে আর আমরা নিজের নিজের 'Wave' (তরঙ্গ) স্বার্থ তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চাইছি। এতে 'Center' (কেন্দ্রের) এর সঙ্গে 'Province' (রাজ্যের) এর 'Clash' (সংঘাত) হচ্ছে। এখন 'Center, Absolute center' (কেন্দ্র পূর্ণ-কেন্দ্রীয় সত্য) এর সঙ্গে এই 'Province' (রাজ্যে) এরা যে সব কল্পিত করছে সেটা ঠিক নয়। সব তাঁর—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং... ....। হেগেল সাহেব যেমন বলেছেন...'For It self' (তাঁর নিজের জন্য)। 'Reality is by it self and for It self' (পরিপূর্ণ বাস্তব সত্য স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং নিজে নিজের জন্যই)। এটা বলতেই হবে মূল তত্ত্ব নিজেই নিজের স্রষ্টা; তাঁকে যদি অন্য কেউ সৃষ্টি করে তবে সে বড় হবে। অতএব বৃহত্তম বস্তু তিনি নিজেই আছেন অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভু' তিনি নিত্য। আরো বলতে হবে 'Reality is for it self' পূর্ণসত্য তাঁর নিজের জন্যই আছেন। যদি আর কারো সন্তোষের জন্য তাঁর সত্তা হয় তাহলে যার সন্তোষের জন্য তাঁর সত্তা সে বড় হবে। তাহলে 'Reality' হতে গেলে, বাস্তব বস্তু হতে গেলে তাঁরই জন্য সব। একটা তৃণ নড়লেও ভগবানের সন্তোষের জন্য। প্রত্যেক 'Part' (অংশ) তাঁর

সেবার জন্য এইটাই হল বাস্তব। আর প্রত্যেক 'Part' (অংশ) নিজে প্রভু হয়ে আসে পাশে সব 'Exploit' (শোষণ, ভোগ) করতে থাকলেই সেটা মায়া, মিথ্যা।

কিন্তু বাস্তব সেটা 'Allow' অর্থাৎ গ্রাহ্য করবে না, সে তার ফলে সংঘাতে মারা পড়ে যাবে। সেই 'Plan' (স্তর) এ যে 'Wave' (তরঙ্গ) তাকে বলছে 'ভক্তি' 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে' যদিও সেটা 'Unseen' (অদৃশ্য) তাহলেও সেই যে 'Vibration' (তরঙ্গপ্রবাহ) সেটা এমন অহৈতুকী তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, কোন কারণ নেই তার আর অপ্রতিহত, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। 'Eternal' (নিত্য) যে 'Wave' (তরঙ্গ) চলছে তাঁর সঙ্গে তোমার ক্ষুদ্রস্বার্থ দিতে গেলে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, কোথায় ভেসে চলে যাবে। সুতরাং সেই যে 'Universal' 'Wave' (অনন্তের তরঙ্গ) চলছে তার সঙ্গে তুমি একীভূত হবার চেষ্টা কর। সেই তালে নাচতে শেখ, তাহলে তোমার আর কোন অসুবিধা হবে না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর একসময় উতঙ্ক বলে এক ঋষির সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হলে পরে সে বলল, "কৃষ্ণ আমি তোমায় অভিসম্পাত করব", কেননা তুমি এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ। এই বিধবার হাহাকার আর পিতৃহীন বালকদের ক্রন্দন এই সবই তোমার দোষ। তুমি এই সব করেছ, তাই আমি তোমায় অভিসম্পাত করব। তখন কৃষ্ণ বললেন, "ব্রাহ্মণ তুমি বহু তপস্যা করে যে ফল, পুণ্যসঞ্চয় করেছ, তা সব চলে

যাবে, আমার কিছুই হবে না, কেননা আমি নির্গুণে অবস্থিত। নির্গুণ অর্থাৎ যে 'Wave' (তরঙ্গ) কে কেউ পরিবর্ত্তন করতে পারে না, সেই 'Wave' (তরঙ্গ) এর সঙ্গে আমার মিল। নির্গুণ মানে 'Negative' (নেতি বাচক) নয়, নির্গুণ মানে নির্ব্যাধি আর গুণ মানে সত্ত্ব, রজ ও তম মায়ার তিনটি গুণ। মায়া হল ব্যাধিজাতীয় জিনিষ, আর নির্গুণ 'Positive' (ইতিবাচক)। নির্গুণ মানে নিরোগ, আর সগুণ মানে ব্যাধিযুক্ত; মায়া যুক্ত। কিন্তু আমি নির্গুণ অর্থাৎ কোন রকম 'Provincial' (ক্ষুদ্র গণ্ডীর) বা Separate interest (পৃথক স্বার্থে) এর 'Under' (অধীনে) নই। আমার যে নাচ চলছে, আমি যা করছি, তা হচ্ছে নির্গুণ।

যদি কেউ স্বার্থপর হয়ে কাজ না করে, সেই 'Universal wave' (অনন্তের তরঙ্গ) এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শেখে, তাতে তার দু-চার হাজার ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেও কিছুই হয় না। পুলিশ যদি সরকারের স্বার্থে খুন করে, তার জন্য সে পুরস্কার পায়, আর যদি নিজে ঘুষ খাবার জন্য দুটো পয়সা পকেটে পুরে তাহলে দণ্ডনীয় হবে। তেমনি 'Universal Interest' (বৃহত্তর স্বার্থ) যেটা চলছে মঙ্গলময় 'Absolute good' (পরম সত্য) তাঁর যে 'Wave' (তরঙ্গ) চলছে তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই নির্গুণ ভূমিকা। আর তাঁর সঙ্গে খাপ খাবেনা এমন যদি কোন উল্টো রকমের 'Wave' (তরঙ্গ) আসে, তাহলে সেগুলি চুরমার হয়ে কোথায় বিলীন হয়ে যাবে, তার কোন ঠিক নাই। সুতরাং তুমি সেই নির্গুণ ভুমিকায় গিয়ে তাঁর

সঙ্গে তাল দিতে শেখ। যে 'Highest Center' (সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্র) যাঁর ইচ্ছায়, যাঁর জন্য এই সব তাঁরই সুখের জন্য সেই কেন্দ্রীয় সুখের জন্য চেষ্টা কর, তাহলে তুমি সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে। তোমার 'Individual position' (ব্যক্তিগত মানবাধিকার) সবচেয়ে বেশী লাভবান হতে পারে, যদি তুমি সেই তালে নাচতে শেখ, চলতে শেখ তাহলে তুমি সুখ পাবে ও সবাইকে সুখ দিতে পারবে। সেই 'Center' (কেন্দ্র) এই রকম যেন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আমাদের শাস্ত্রে আছে বেদাদি শাস্ত্রে—

যস্মিন জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তম্ ভবতি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।

যাঁকে জানলে সব জানা হয়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, তাঁকে অনুসন্ধান কর তিনিই ব্রহ্ম। বেদান্তে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' প্রথমেই আমরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করব কেন ? 'জন্মাদস্য যতঃ'.....। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ যেখান থেকে হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ যেখান থেকে যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই 'Cause' (কারণ) টা আমরা জানব। আমরা কোথায় আছি, আমরা কে, আমাদের কি 'Position, (অধিকার) এসব জানার চেষ্টা করব। একটা Town (শহর)-এ গিয়ে 'Civic Law' (সভ্য আইন) টা জানার চেষ্টা কর, কোথায় রাস্তা, কোথায় গাড়ী ইত্যাদি না জানলে

ভয়ানক অসুবিধা হবে তেমনি যেখানে বাস করছ এ-জগতে সেখানকার Rules Regulation (নিয়ম কানুন) গুলি একটু বোঝ। কে তুমি, কোথা হতে এলে, কে তোমায় রেখেছে এবং কোথায় তোমাকে শেষ কালে প্রবেশ করতে হচ্ছে এগুলি তোমার তো জানা উচিত, নিজের 'Interest' (স্বার্থ)-এ— 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।'

এতে যার বিশ্বাস হলো তাকে বলে শ্রদ্ধা 'Faith' (বিশ্বাস) চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥

(গীঃ ১৮ ৬৬)

—অর্থাৎ একটি জিনিস আছে যাঁর প্রতি কর্ত্তব্য করলে আমার সব করা হয়ে যায়। গীতায় যেমন বলেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবান বলেছেন আমার 'Position' (অধিকার) টা বোঝ, শুধু অধর্ম্মই নয়, ধর্ম্ম বলতে যা কিছু বোঝ সব ছেড়ে দাও, সব ধর্ম্ম ছেড়ে দাও, ভাল মন্দ সব রকমের 'Duty' (কর্ত্তব্য) ছেড়ে দাও, শুধু আমার দিকে আস' কিছু ভাবতে হবে না আমি সব সামলাব। কেউ বলতে পারেন এটা কেমন করে হয়? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ গাছের মূলে জল দিলে তার ডাল-পালা সকলেরই খাওয়া হয়, পেটে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত শরীরের কাজ হয় তেমনি স্বয়ং ভগবানের সেবার দ্বারা সব কর্ত্তব্যই সম্পাদন হয়। সুতরাং ভগবানের 'Position' (অধিকার) এরকম।

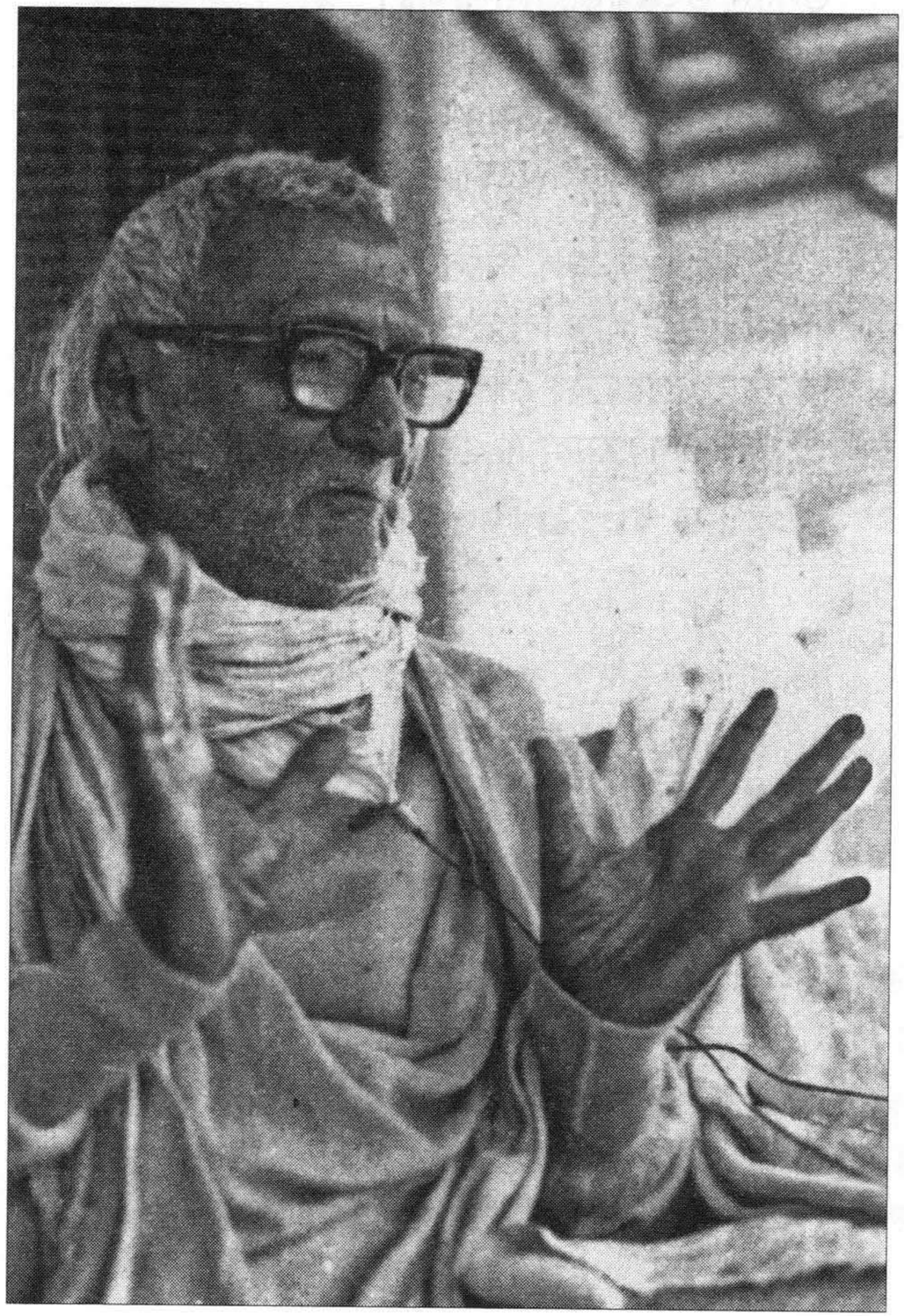

জীবের চরম প্রাপ্তি

জনৈক ভক্তঃ—দণ্ডবৎ প্রণাম মহারাজ ! অনেকদিন আপনার দর্শন পাই নাই। চারিদিকে বিপদ ও নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। তাই সময় মত আসতে পারি না।

শ্রীল গুরুমহারাজঃ—এই জগতের প্রতি দুর্ব্বার আকর্ষণ, রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কারই হল মূল বিপদ। সংস্কারাবদ্ধ আমাদের আসক্তিই এখন পথ-প্রদর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তারই হাত হতে নিস্কৃতি পাওয়া দরকার। আত্মরক্ষা করা দরকার। শান্তিলাভের জন্য, আনন্দ লাভের জন্য, সুখ লাভের জন্য আমরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছি। পারিপার্শ্বিকতাকে দোষ দিচ্ছি কিন্তু মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় পাচ্ছি না। তাদের reform (সংস্কার) করতে চাই কিন্তু তা Impossible শান্তি লাভের চাবিকাঠি নিজেকে Control (সংযত) করা এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে Adjust (সমন্বয়) করা। ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ সবই আগমাপায়ী। তুমি নিজের দিকে তাকাও। নিজের প্রতি সুবিচার কর। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হল সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। দায়িত্বটা নিজের কাঁধে না রেখে আমার ওপর

ছেড়ে দাও। এই হল গীতার দান। একজন জার্ম্মান্ পণ্ডিত—নামটা মনে পড়ছে না (আমরা কলেজে পড়েছিলাম তাঁর সম্বন্ধে)। তিনি বলেছিলেন—গীতা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। কেননা গীতায় বলেছে environment (পরিবেশ) এর ওপর তোমার কোন হাত নাই। তুমি নিজেকে control (সংযত) করে তার সঙ্গে adjust (সমন্বয়) করে নাও শান্তি পাবে। যাইহোক শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য আরও উন্নত বিচারের এক স্টেপ্ এগিয়ে দিয়েছেন।

তত্ত্বেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমানো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তি পদে স দায়ভাক্।"

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভগবানের হাত রয়েছে। তিনি নিষ্ঠুরও নন অবিচারকও নন। যা কিছু আসছে তোমার কল্যাণের জন্য আসছে। তিনি মঙ্গলময়। এবং স্নেহময়। সম্পদ বিপদ পারিপার্শ্বিকতা সব কিছুর মূলে তাঁর ইচ্ছা কাজ করছে এবং সবটাই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর Sanction (অনুমোদন) ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না। তিনি সজাগ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছেন। অতএব বন্ধুভাবে সব কিছুকে ফেস্ করতে হবে। 'ভুঞ্জান এবত্ম-কৃতং বিপাকং।' দোষটা নিজের ঘাড়ে নাও। তাঁর রাজ্যে সবই সুন্দর। সেই সুন্দরের Influence (প্রভাব) এসে তোমাকেও সুন্দর করে দেবে। এই বিচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই দেখবে তুমি সব ঝামেলা হতে মুক্তি লাভ করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছ।

সুন্দরের দেশে প্রবেশ লাভ করেছ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। অখিল কল্যাণ গুণখনি তিনি। শুধু কর্ম্ম বা জ্ঞানমুক্তি নয়, মুক্ত স্বরূপে-তোমার Orginal (মূল) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" অর্থাৎ সেবাভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকটী আমাদের অনেক আশা অনেক ভরসা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু Proper adjustment (যথাযথ সমন্বয়) দরকার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যেখানে যেখানে ভেসে উঠছি, সেই-খানে একটা করে ডিউটী পড়ে যাচ্ছে। এর আর শেষ নাই বা এভাবে একে শেষ করা যাবেও না। তুমি কত Demand (চাহিদা) মেটাবে, তাই ভগবান গীতায় যেন সোনার থালায় অমৃত পরিবেশন করে দিয়েছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীঃ ১৮।৬৬)

Absolute call of life (জীবনে পরিপূর্ণের আহ্বান) ঐ দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চল। ভগবান বলছেন—"আমি আছি কোন অসুবিধা হবে না। সব দায়িত্ব আমি নেব।" আমি যখন মঠে এলাম, আমার গুরুদেবের কাছে, সেই সময়ের ঘটনা বলি। শ্রীমায়াপুর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল, মন্দিরেতে ঠাকুর গেলেন। মহাপ্রভুর জন্মোৎসব পরিক্রমা শেষ হয়েছে।

উৎসব শেষে যে যার বাড়ী যাচ্ছেন। শ্রীল প্রভুপাদ একটী ক্যানভাসের চেয়ারে বারান্দায় বসে আছেন। আমি শোনার আগ্রহ নিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে বসেছি, বাড়ী যাবার আগে ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করতে এসেছেন। প্রভুপাদ তাঁদের বললেন—'আপনারা আমাকে বঞ্চিত করবেন না।' আমি কান-খাড়া করলাম। বঞ্চিত হবার কি আছে? উৎসব সমাপ্ত হল, যে যার বাড়ী যাচ্ছেন—এতে বঞ্চনার কি হল? প্রভুপাদ বলছেন—আপনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—আপনারা কৃষ্ণ-ভজন করবেন। আমিও সেই জন্যে আপনাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হয়েছি। এখন দু'চার দিনের জন্য এসে আবার ফিরে যাচ্ছেন—সেই আবার সংসারেই। তা হলে তো আমি বঞ্চিতই হয়ে গেলাম। যদি বলেন, না প্রভু ! বঞ্চনা করি নাই, এই দু'চারদিন একটু কাজ কর্ম্ম গুছিয়ে চুকিয়ে দিয়ে আমরা আবার ফিরে আসছি, এলে যা বলবেন তাই করবো। আমি বলবো তার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বলেন যে ঘরে আগুন লেগেছে আগুনটা নিভিয়ে দিয়েই আসছি, আমি বলবো তারও প্রয়োজন নাই। আপনাদের, আমাদের সকলেরই একমাত্র স্বার্থগতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সেবা ছাড়া জীবের আর কোন Duty (কর্ত্তব্য) নাই। সমগ্র দুনিয়া ছারখার হয়ে গেলেও আপনার কোন ক্ষতি হয় না। আপনি চিন্ময় জীবাত্মা। আপনি মরেন না, পোড়েন না, আপনি নিত্য সনাতন তত্ত্ব। একমাত্র কৃষ্ণসেবা ছাড়া আপনার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। আপনার যাবতীয় প্রয়োজন সব কৃষ্ণপাদপদ্মে। সেই সময় আমি Finally

Surrender (চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ) করলাম তাঁর চরণে। বুঝলাম সতিই তো আমরা সুখ চাচ্ছি, শান্তি চাচ্ছি, রস চাচ্ছি, যা কিছু চাচ্ছি তার ভেতর Unconsciously (অচেতনভাবে) তাঁকেই চাচ্ছি। কেননা তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। রসই হল Medium (মাধ্যম)। যেমন টাকা পয়সা, পাউণ্ড, ডলার, রুবল প্রভৃতির মূল Standard (মানদণ্ড) হচ্ছে Gold (সোনা); সেই রকম আস্তিক হতে নাস্তিক পর্য্যন্ত সকলের—সব কিছুর মূল Standard (মানদণ্ড) হচ্ছে 'রস। এজগতে সে জিনিষ কোথায় পাবে? ঐ পরতত্ত্বে Absolutely Surrender (পূর্ণ সমর্পণ) ছাড়া আর কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কেননা বেদান্ত বলছেন "রসো বৈ সঃ" তিনিই হলেন অখিল রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ। "চৈতন্যোরসবিগ্রহ" Ecstasy সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। Reality the Beautiful (সত্য ও সুন্দর) তা সে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ পন্থা—কোন পন্থাতেই তো পাবে না—ঐকান্তিক শরণাগতি ছাড়া সে জিনিস পাওয়ার আর কোন পথ নাই।

"কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ
তাতে কৃষ্ণকরুণা সাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই যখন রাম রায়ের মুখে শুনলেন যে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি" তখন বললেন, হাঁ, "এহো হয় আগে কহ আর॥" জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। Super subjective

এরিয়াতে যেতে হবে। জ্ঞানের চরম ভূমিকা হচ্ছে justice (ন্যায়)। কিন্তু justice (ন্যায়) এর উপর হল Mercy (দয়া)। জ্ঞান তা দিতে পারে না। স্নেহময় ভূমিকা, সেবাময় ভূমিকায় সেইটা পাওয়া সম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে সেই দিকে টেনে নেবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। বাস্তব জীবনের একমাত্র Solution (সমাধান) হচ্ছে ব্রহ্ম পরমাত্মার অনেক ওপরে যে ভগবৎ ধাম, সেই ধামের মধ্যে জ্ঞানশূন্যাভক্তির যে বিভিন্ন উত্তমোত্তম প্রকোষ্ঠে ভগবানের সেবাবিলাস চলছে, কোনপ্রকারে সেইখানে একটু আশ্রয় করে নেওয়া। সেইটাই হল জীবের চরম প্রাপ্তি। একমাত্র সম্পদ।

সমস্যা ও সমাধান

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু বহির্ম্মুখ বিশ্বপরিস্থিতির প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের উপায়-স্বরূপ Peaceful Coexistence (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) এর কথা বলেছিলেন। সমরোন্মুখ জাতিসমূহের মত্ততায় বিশ্বশান্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা একথা সকলেই স্বীকার করেন। Peaceful Coexistence (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) নীতি To the point অনুঃস্থত হলে কোটী কোটী মুদ্রাব্যয়ের দ্বারা সমর-সম্ভার সংগ্রহ, সৈন্যবিভাগে বা দেশরক্ষা বিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না; অধিকন্তু সেই সমস্ত অর্থ নিজ দেশ উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করলে, দেশ সমৃদ্ধিশালী হবে এবং দেশের জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এই নীতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করলে জনসাধারণের সুবিধার্থে নিযুক্ত পুলিশবাহিনীরও প্রয়োজন হ্রাস হবে,—এটি সত্য কথা। মানব-মেধায় এটি অসম্ভব মনে হলেও এটি শান্তির ও ভারতীয় রাজনীতির একটি সূত্র।

এখন দেখতে হবে এই নীতির মূল কোথায়? নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শির চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে—এটির মূল হচ্ছে

অন্তর-জগৎ-সম্বন্ধ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। জীব অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি বা ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা চালিত না হলে Peaceful Coexistence (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) নীতির অনুসরণ করতে পারে না। অর্থাৎ Negative (অনিত্য) জগতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তির সম্ভাবনাই হয় না—যতক্ষণ না Positive (নিত্য) জগতের সঙ্গে জীব সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর Positive (নিত্য) জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে জগতের Negative (অনিত্য) ছোট-বড়, লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়—সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়ে থাকে।

পারমার্থিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়—তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ এই নশ্বর জগতে বা বহির্জ্জগতে বসবাসের পাকাপোক্ত ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ না দিয়ে, কিভাবে অন্তর জগতের বা নিত্য-জগতের মেম্বারশিপ লাভ করা যায়, সেই দিকেই তাঁদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করতেন এবং সাফল্যলাভও করতেন। এজগতে যতটুকু বস্তু বা পদার্থ জীবন-যাত্রার জন্য সহজপ্রাপ্য—সেইটুকুই স্বীকার করতেন। যেখান হ'তে আজই হোক আর দু'দিন পরেই হোক বিদায় নিতেই হবে, সেই পান্থশালা সদৃশ জগতে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করায় কোন স্থায়ী লাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ মহাত্মা চরিত্রও ইতিহাস প্রসিদ্ধ—যাঁরা বহুযুগ পরমায়ু লাভ করেও তা অসীমকালের তুলনায় ক্ষণকাল বোধে বৃক্ষতলে বাস করে নিত্যজগৎ-ভ্রমণের সোপান রচনা করতেন। আবার কোন মহাত্মা বস্ত্রাদি সংগ্রহ চেষ্টাকেও বৃথা

কালক্ষেপ মনে করে দিগ্ বসনেই থাকতেন। ইহা সেই মহৎ সংস্কৃতির দেশ। অতএব দেখতে হবে আমাদের সমস্যা ও তার সমাধান কি ? Peaceful Coexistence (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) নীতির দ্বারা এই জগৎ-সমস্যার উগ্রতা তৎকালিক প্রশমিত হ'লেও তা যে চিরকালের জন্য নয়—ইহা বলাই বাহুল্য। কেননা সমস্যা যার দ্বারা রচিত বা গঠিত সেই বস্তুটী জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াসত্ত্বা সম্পন্ন. অর্থাৎ চেতন।

"ভাত কাপড়ের সমস্যা কিছু সমস্যাই নয়"। যে দেশে ভাত-কাপড় আছে, প্রচুর অর্থাদি আছে, তারাও সমস্যার হাত এড়াতে পারেন নাই। অশান্তি সেখানেও কম নয়। বর্ত্তমানে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী দেশ; কিন্তু সেদিকে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখবেন—সেখানকার সবচেয়ে যাঁরা ধনী বলে প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্যে ডুবে আছেন, তাঁদের আত্মহত্যার সংখ্যা পৃথিবীর সব দেশের রেকর্ড ভঙ্গ করছে। অতএব দেখতে হবে গলদ কোথায় ? অন্নহীনের কাছে অন্নের আশা বা শান্তিহীনের কাছে শান্তির আশা যেমন অর্থহীন, সমস্যাগ্রস্ত জীবের কাছে সমস্যার সমাধানের আশাও তদ্রূপ অমূলক। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করেছেন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস—ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদগীতার মাধ্যমে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত—সমস্যার চরম অবস্থার সমাধান প্রদানের জন্য আবির্ভূত। আমরা মহাত্মা ভীষ্ম-বাক্যে

জানতে পারি, মহাবীর অর্জ্জুন—যিনি এক মূহুর্ত্তের মধ্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীপূর্ণ সমস্ত সমরক্ষেত্রের সমাধান এনে দিতে পারেন,—তিনি যখন সর্ব্ববল সম্পন্ন, নিগ্রহ অনুগ্রহ সমর্থ হয়েও নিজেই সমস্যার সমাধানে ব্যাকুল—তখনই শ্রীমদ্ভগবদগীতার আবির্ভাব । অপরপক্ষে যিনি দেশের সমস্ত সমাধানের মালিক, হর্ত্তা-কর্ত্তা, বিধাতা বলে পূজিত, তিনি যখন বুঝতে পারলেন, সাতদিনের নোটিশে এ জগৎই ছেড়ে যেতে হবে—তখন তাঁর সমস্যার গুরুত্বের কথা ভেবে দেখুন; দেখবেন—সমস্ত সমস্যার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর সমস্যায়; সেই সময় যিনি সুষ্ঠুরূপে সমাধান দিতে আবির্ভূত—তিনিই "শোকমোহভয়াপহা" শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদগীতা কোন সাম্প্রদায়িক ভাবধারা পোষণ করেন নাই। সার্ব্বজনীন ভাবে আমাদের সমাধান প্রদান করেছেন। সর্ব্বপ্রকার সমস্যাগ্রস্ত হলেও যে বস্তু আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করতে পারে, তাই প্রদান করেছেন। এইজন্য ঐ দুই সূর্য্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এখনো সসম্মানে বিরাজিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই ধরুন। পরীক্ষিত মহারাজ যখন চরম বিপদাবস্থা (?) প্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মনীষী—ঋষিগণের বিভিন্ন মতবাদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বস্থায় মহাচিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন, তখনই যদৃচ্ছাগত শুকদেবের আগমন। পরীক্ষিতের প্রশ্ন কিছু দল বিশেষের বা জাতি বিশেষের প্রশ্ন নয়—শুধু মানুষেরও নয়—সমস্ত জীব-চৈতন্যের প্রশ্ন। সেই

চরম মূহুর্ত্তে তাঁর একমাত্র প্রশ্ন—কি প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা এই অত্যল্প সময়ে পরমমঙ্গল—পরাশান্তি লাভ করতে পারা যায়। কিভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ-লাভ করা সম্ভব?

সমস্যাযুক্ত পরীক্ষিৎ; সমাধান প্রদাতা শুকদেব। একজন সমস্যার চরমবস্থায় উপনীত, অপর জন—সমাধানের চরমাবস্থালব্ধ। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকা পাঠ করলে আরও সবিশেষ জানতে পারবেন।

পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আব্রহ্মস্তম্ভপূজিত আত্মারাম শ্রীশুকদেব বলেছেন—হে রাজন ! আপনার এই প্রশ্ন শুধু আপনারই নয়, ইহা সমস্ত জগতের প্রশ্ন এবং ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন।

"শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র ! নৃণাং সন্তি সহস্রসঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

এ জগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, হতে বিভিন্ন স্তরের মানব পর্য্যন্ত সকলেই নিজ প্রয়োজনে ব্যস্ত, আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতিই এদের প্রয়োজন, আর প্রয়োজনের খাতিরেই যত সমস্যার উৎপত্তি। কিন্তু এরা সকলেই অনাত্মবিৎ। কেন না আত্মবিতের প্রোগ্রাম একটিই। যারা নিজেকে দেখতে পায়নি—যারা নিজের প্রয়োজন দেখতেই শেখেনি—তারাই স্বীকার করবে ঐগুলিকে প্রয়োজন বলে। কিন্তু যারা নিজেকে জানে, নিজের প্রয়োজন যথাযথ ভাবে জানে, তারা আপনার

এই প্রশ্নকেই প্রকৃত প্রশ্ন বা একমত্র প্রশ্ন বলে স্বীকার করবে। অনাত্মবিতের প্রোগ্রাম চিরদিনই আগের জন্য booked হয়ে থাকবেই, কেন না তারা—"গৃহেষু গৃহমেধিনাম।

আত্মবিৎ-এর একমাত্র প্রোগ্রাম—অবিদ্যার হাত হতে উদ্ধার পাওয়া যে ব্যক্তি জলে ডুবে গেছে তার প্রোগ্রাম্—তার সমস্ত চেষ্টাই হবে কিভাবে বাঁচতে পারা যায়। এজগতের উন্নতির জন্য যত প্রকার বহির্ম্মুখী প্রচেষ্টাই চলুক্—সমস্ত প্রচেষ্টাই মৃত্যুর এপারে থেকে যাবে। "অজ্ঞানেনাবৃতম্ জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" কেবল মোহগ্রস্ত হয়ে দেহ হতে দেহে ছুটাছুটি করা আর জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া অনাত্মবিদের অন্য কোন ফলই লাভ হয় না। সমস্ত চেতনই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে দেহাত্মহং বুদ্ধি নিয়ে অনন্তকাল ধরে জন্ম মৃত্যুর অধীনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থার হাত হতে immediate relief (তাৎক্ষণিক মুক্তি) অর্থবল, জনবল, সমরোপকরণ যতই বাড়ুক্ না কেন তার দ্বারা পাওয়া যাবে না। বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—কিছুই আমার নয়। এমনকি দেহটাও নয়। এ দেহাদিতে 'আমি' বা 'আমার' বুদ্ধিই—পশুবুদ্ধি। যতদিন এই গুলিতে আমি বা আমার বুদ্ধি থাকবে, ততদিন আমার সমস্যাও থাকবেই। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি—ততদিন আমাকে ভেল্কি লাগিয়ে দেহ হতে দেহান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে; এবং তাদের হাত হতে রেহাই পাবার পথও ঐ ভাবে অনন্তকালেও আবিষ্কার করতে পারা যাবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—তোমরা ভাল করে সমস্যা দেখতেই শেখ নাই। সমস্যা দেখার পথ হচ্ছে—'স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদঃ।' যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে 'বাঘে ধরেছে' বলে চিৎকার করে, তাকে জাগিয়ে দিলেই সমাধান হয়ে যায়; জাগালেই সে দেখবে সবই ঠিক আছে। দেখবে যে জন্য দিবারাত্র relief-এর আশায় সহস্র প্রোগ্রামের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়—সে গুলি কাহারও problem নয়। শুকদেব বলেছেন—'ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধি'—অর্থাৎ মরাটা animal conception তুমি মর না—won't die, হাজার রকমের সমস্যা তোমার নাই। back to God—আত্মস্থ হও। 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'—অন্যথারূপ পরিত্যাগ কর। তুমি চিদাকাশের মেম্বার। যেটিকে তুমি অমৃত বলে ভাবছো—সেটা বিষ। যেটিকে তুমি সুখ-দুঃখ আমার-তোমার বলে মনে করছ সেগুলি কিছুই নয়। সমস্তই অবিদ্যা। "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"; অবিদ্যাকে পিছনে ফেলে আলোর দিকে এগিয়ে চল। জড় হতে চেতনের দিকে অভিযান কর – আবর্জ্জনার হাত হতে বাঁচবে,—'To make the best of a bad bargain.'

প্রাচ্য হ'তে পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত আত্মানুভবকর্ত্তৃগণের মুখে ঐ এক কথা। সকলেই বলেন—চিলের পিছনে না ছুটে একবার কানে হাত দিয়ে দেখ। বেদাদিতে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণকে—বিক্ষিপ্তমতি পাগলকে 'self centre' করার

জন্য বহুপ্রকার সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। অসংস্কৃত জীবকে সেই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে আত্মজগতে উন্নীত করতে পারলেই সে তখন নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করতে পারে। "যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরন্। ততো ততো নিয়ম্যেতদাত্মান্যেব বশং নয়েৎ ॥" সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টাই হচ্ছে—shadow (ছায়া) হতে substance (বস্তু)-এর দিকে—phenomena (দৃশ্য) হতে reality (বাস্তব)-এর দিকে—একমুখী অভিযান এবং একেই বলে প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি হলেই সব সমাধান হয়ে যাবে।

শুদ্ধজ্ঞানে এখানকার অবস্থিতি নাকচ্ করতে পারলেও ভাবী জগতের সম্বন্ধে বা প্রাপ্তি বিষয়েও আবার সমস্যা এসে পড়ে। অতএব এখন সেই সম্বন্ধে যৎসামান্য বলে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

জড় হ'তে চেতনের দিকে অভিযান ব্যাপারে বিভিন্ন আচার্য্যগণের বিভিন্ন পন্থা দেখা যায়। কিন্তু মহাকাশের নক্ষত্র-সমূহ এখান হ'তে একই plane-এ দেখা গেলেও তাদের তফাৎ যেমন বহু সহস্র light-year তদ্রূপ আচার্য্যগণের দানেরও প্রচুর তারতম্য বিদ্যমান। আর সেইগুলি যথাযথ ভাবে বুঝতে পারলে তখন শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ সংবাদে আমি আমার এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান সুন্দররূপে পেয়েছি। আপনারা সদনুগত হয়ে চরিতামৃতের অষ্টম অধ্যায়টি পাঠ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

প্রাপ্তির স্তরভেদানুসারে প্রাপ্ত্যুপায়েরও স্তরভেদ রয়েছে। আচার্য্যগণও সে বিষয়ে নিজ নিজ অনুভূতি ও নিষ্ঠানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আলোক সম্পাতের দ্বারা জীবজগতের শুভাকাঙ্খা করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার অপূর্ব্ব প্রভায় সমস্তই পরিপূর্ণ ম্লানতা প্রাপ্ত। অনাদিরাদি পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করবার জন্য—সাধ্যের চরমপ্রাপ্তির উপায় যখন নিজমুখে কীর্ত্তন ও নিজে আচরণমুখে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক স্বরূপ প্রকট করেন, তখনই তাঁর কৃপায় তাঁকে 'স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী ভগবান' রূপে অনুভব হয় এবং তখনই শ্রীরূপোক্ত প্রণাম মন্ত্রে—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"—নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হতে পারি। সেই শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতের নির্য্যাসের উৎকর্ষতাই ধারাবাহিকরূপে আমরা রামানন্দ সংবাদে সংক্ষেপে দেখতে পাই।

নরলীল মহাপ্রভু বললেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" কিসের জন্য জীবসকল নিজের সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োজিত করবে, সেইটি তুমি 'authority' (শাস্ত্রযুক্তি) দ্বারা প্রমাণ কর। এই সাধ্যবিষয়ে প্রশ্নটুকু বহুজন্মের ভাগ্যফলে জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। বেদান্ত-দর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে আচার্য্যগণ আমাদিগকে সেকথা বিশদ ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। মহাপ্রভু এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর খোলাখুলি ভাবে রামরায়ের কাছ থেকে শুনতে

চাচ্ছেন। কেন? "স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥' আবার শুধু মুখের কথাতেই নয় শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা authority-র দ্বারা প্রমাণ করতে বলছেন। রামানন্দ রায়ও মহাপ্রভুর কথার উওর প্রদানমুখে সেইরূপ গম্ভীর বিভিন্ন মতবাদের উত্থাপন ও সমাধান করতে করতে ক্রমশঃই চরমসাধ্যের শেষ সীমায় উপনীত হচ্ছেন।

"রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" স্বধর্ম্ম কি?—বর্ণাশ্রম বিহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন। সাধ্য—বিষ্ণুভক্তি। বিষ্ণু কে? বিশ্বং ব্যাপ্নোতি। ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরের মধ্যে আত্মা—আর আত্মার আত্মা হচ্ছেন বিষ্ণু। তিনিই owner (মালিক), সমগ্র জগতের internal substance (আন্তর নির্য্যাস)। "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" তাঁকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। রায় রামানন্দ এখানে নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন করে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম পালনের দ্বারাই সেই বিষ্ণুভক্তি হয় বলে সাধ্যপ্রমাণ বললেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে সম্বন্ধোপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বলে মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" অর্থাৎ এগুলি অত্যন্ত বহির্ম্মুখদের জন্য। এটি ছ'মাসের রাস্তা; অতএব direct-approach (সরাসরি পাওয়া)-এর কথা বল। তখন "রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার ॥ প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার ॥" ... কর্ম্মমিশ্রাভক্তি নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ইহার কোনটাই

প্রকৃত সাধ্য বা সাধন নহে। উত্তরোত্তর advance stage (উন্নতর স্তর)-এর কথা থাকলেও প্রত্যেকটিতেই নিজের বুঝ্দার বা মাপদার ভাব রয়েছে। প্রত্যেকটিতেই মায়ার স্পর্শ আছে। কিন্তু যখন "রায় কহে জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্য সার।' তখন মহাপ্রভু বললেন—"এহো হয়" অর্থাৎ এইবার প্রকৃতপথে আসা হয়েছে। জ্ঞানশূন্যাভক্তি থেকেই প্রকৃত ভক্তির আরম্ভ। বাইবেলেও দেখা যায়, জ্ঞানবৃক্ষের ফলই পতনের কারণ। সব জিনিষ আমার বোঝা চাই—এটা অগ্রাহ্য করতে হবে। যেহেতু মেপে নেওয়া বুদ্ধিই দুষ্ট বুদ্ধি। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা তাঁকে ত' দূরের কথা, একটু অণু-পরমাণুকে মেপে শেষ করার ক্ষমতা নাই। এইজন্য ভাগবতের প্রমাণ দিয়ে বললেন—"জ্ঞানেপ্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি।" তোমার বুঝে নেবার কতটুকুই বা ক্ষমতা আর কিই বা বোঝ। তোমার চেয়ে কোটীগুণ অনন্তগুণ তোমার মঙ্গল বুঝবার লোক আছে; তুমি কেবল তোমার বুঝদার ভাবকে (উদপাস্য) ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে "নমন্ত এব জীবন্তি" এই পন্থা অবলম্বন কর। দেখবে—বিদ্যুদযানের মত লিফটের মত বৈকুণ্ঠ ভূমিকায় তুমি উন্নীত হয়ে যাবে। যেটি তোমার বাধক ছিল, দেখবে সেইটাই তোমার সাধক হয়েছে। আর কি "সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্"। Submissive hearing (বিনম্র শ্রবণ) দিতে শিখলেই দেখবে, তোমার চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ শেষ হয়ে গেছে। আর hearing (শ্রবণ) দিতে হবে; কোথায়? যিনি properly guide (যথাযথ মার্গদর্শন) করতে

পারেন তাঁর কাছে। প্রকৃত পক্ষে proper guidence (পথ প্রদর্শন) দরকার। এটাই তোমায় বাঁচাবে। "স্থানে স্থিতাঃ" তুমি যে কোন অবস্থাতেই থাক, সেইখান হতেই attend (যোগ দাও) কর—দেখবে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেন না সাধুমুখ নিঃস্বত ভগবৎ কথাই একমাত্র বাঁচাতে পারে। যিনি এইভাবে চলেন, তাঁর দ্বারা ভগবান যতই দুর্ভেদ্য, দুর্ল্লভ, অজিততত্ত্ব হোন না কেন—জিত হন। ভগবদুক্তির সর্ব্বত্রই রয়েছে—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"। সাধুসঙ্গে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির আশ্রয়ে অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথায় intellectual giant (বুদ্ধি পারঙ্গত)-ও পারে না। এইজন্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের ভাষ্যে সাধুসঙ্গের কথা প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন। সাধু হচ্ছেন living source (জীবন্ত উৎস)। কোন গুণ না থাকলেও সাধুসঙ্গের প্রভাবে "সর্ব্বৈগুণৈস্তত্রসমাসতে।" সাধুসঙ্গের প্রভাবে অত্যন্ত ঘৃণ্যকেও ভগবৎ সেবোপকরণ করে তোলে। পূজ্য বা সেব্য-দর্শনই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ-দর্শন। Miss Mayo প্রভৃতি অনেকেই এই পূজ্য জিনিষের কদর্য্যভাব প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পূজার বাতাস পর্য্যন্ত পায় নাই; পূজ্য তত্ত্ব হতে তারা চিরদিনই সহস্র যোজন দূরে থাকবে। প্রকৃত পূজ্য বুদ্ধি নিয়ে যে approach করতে পারে, তার কোন ভয়ই থাকে না। ভয় নিজেই তাকে দেখে পালিয়ে যায়। যার আশ্রয়ে থাকলে সমস্ত কুৎসিৎ ভাব সমস্ত কুৎসিৎ বিচার প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস হয়ে যায়—সেই পূজ্যবুদ্ধিই মায়িক দর্শন হতে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র

উপায়। ভাগবতের "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ" শ্লোকে আমরা সেই শিক্ষাই লাভ করি। তোমার কুদর্শন, তোমার ব্যাধি, তোমার heart disease (হৃদ রোগ) কাম—একবারে সেরে যাবে, যদি পূজ্য-বুদ্ধির আশ্রিত হতে পার। যাঁরা লিঙ্গপুরাণাদি রচনা করেছেন, তাঁদের কি তোমার মত এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও ছিল না—না, তোমার চেয়ে তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি কিছু কম ছিল? কিন্তু তবুও তাঁরা লিখেছেন—তবুও তাঁরা শোক-মোহ দ্বন্দ্বাতীত ভুমিকা হতে আমাদের মঙ্গলের জন্যই লিখেছেন—কেন? না আমাদের জুজুর ভয় হতে রেহাই দেবার জন্য—আমাদের ভোগ্যদর্শনের চির সমাধি দেবার জন্য—আমাদের প্রাকৃত বিচার নিরাশ করার জন্য। পাছে জীবের ভগবত্তত্ত্বে প্রাকৃত ভাব আসে, সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ আত্মারাম শুকদেবগোস্বামী অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, অগস্ত্য, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মনেতৃবর্গের মহান সভায় প্রথমেই নিজের পরিচয় প্রদানমুখে সাবধান করে দিচ্ছেন যে—নির্গুণে পরিনিষ্ঠিত আমার পরিচয় আপনারা সকলেই জানেন, অতএব মনে রাখবেন—আমার মত ব্যক্তিও যাঁর চরিতগাথায় মুগ্ধ হয়ে, আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত ভুলেছে, তাহা প্রাকৃত পুরুষের কামময়ী চরিতগাথা বিশেষ বা সাধারণ কথা নহে। আমি এ দুনিয়ার কিছু বলি না বা বলবো না বা বলছি না। আমি সেই বস্তুর কথা আপনাদের পরিবেশন করছি যাঁর চরণে অর্পণ বিনা 'তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো' মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ" কোন মঙ্গলই লাভ করতে পারে না। এই বলে তিনি তুরীয় ভূমিকার অবতারণা করলেন। অতএব যারা

প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণকে বা তদীয় লীলাকে দর্শন করেন, তারা শুধু বঞ্চিতই হন না, পরন্তু মহা অপরাধ করেন এবং তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্যদর্শন চিরদিনই আত্মগোপন করে থাকেন।

ভগবান তুরীয় বস্তু। তাঁর সমস্তই "সত্যং শিবং সুন্দরম্", শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বতোভাবে সেই সুন্দরেরই আরাধনার কথা জগৎকে জানিয়েছেন, আর তাঁর আরাধনা প্রণালীও এরূপ সুন্দর যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত পন্থায় "গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ" লাভ করতে পারে। ভগবান তার ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে যান। এবং সেইখানেই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভগবানের ভগবত্তার চরমপ্রকাশ। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" ভগবৎ স্বরূপের fullest adjustment (পরিপূর্ণ সমন্বয়) হচ্ছে—'সর্ব্বোত্তম নরলীলা',—যেখানে তাঁকে "অতুলং শ্যামসুন্দরম্" রূপে 'all accommodative' রূপে পেয়ে ভক্তগণ আশ্রিতগণ নিত্যকাল পূর্ণ পঞ্চরসে সেবা করেন এবং তাহাই চরম প্রাপ্তিসীমা। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই সুদুর্ল্লভ বস্তুকে—অসাধ্যধনকে অত্যন্ত সুলভ করে দিয়েছেন, এইজন্য তিনিই একমাত্র মহাবদান্য। এইজন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ অত্যন্ত কাকুতি করে মিনতি করে জগৎ জীবকে তাঁর চরণে শরণাগতি বিধানের জন্য কাতর আহ্বান করে বলেছেন—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

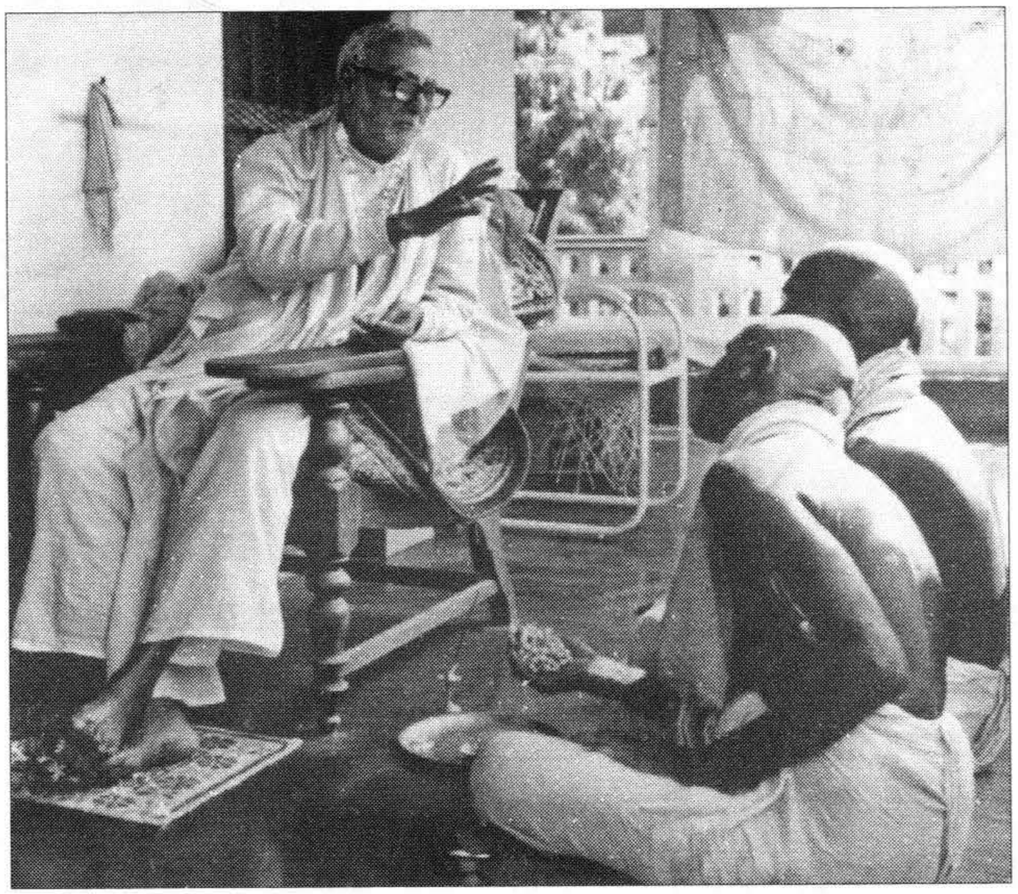

পরমার্থ লাভের পন্থা

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অর্থাৎ—

'শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকুল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

আর—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অর্থাৎ—

'আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥

একটা negative (ন্যস্ত্যর্থক) আর একটা positive (অস্ত্যর্থক)। পূর্ব্বে ত্যাগী জীবনেরই প্রাধান্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে বেদ,

উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি মন্থন করে এবং তার অর্থ অনুধাবন করে ব্যাসদেব যে বিচার দিয়ে গেলেন তাতে বললেন যে, সমস্ত বিষয় বিষ নয়, ত্যাজ্য নয়, তাকে আমাদের যথাযথ অনুধাবন করে সেই প্রকার ব্যবহার করতে হবে।

ভোগ, ত্যাগ ও সেবা এই তিন রকমের বিচার আমরা দেখতে পাই। ভোগের মধ্যে কুভোগ সুভোগ আছে, ত্যাগের মধ্যেও রকমারী আছে। ভোগকে ত্যাগ করেই সাধু হওয়া যায় এইটিই কোন কোন সম্প্রদায়ের ধারণা। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তা বলেননি, তাঁরা তৃতীয় জীবনের কথা বলেছেন যাতে ভোগ এবং ত্যাগ এ দুটিই অপরাধ জনক। ভোগ করা অপরাধ অর্থাৎ অন্যকে নিজের কাজে লাগানো, এর পরিণাম ভাল নয় এটা অনেকেই সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু ভোগকে ত্যাগই সমাপ্তি নয়, কারণ ত্যাগ ভোগেরই মত অনেক সময় তার চেয়ে ক্ষতিকারক আমাদের ভোগেরও অধিকার নেই ত্যাগেরও অধিকার নেই, দুটিই অপরাধজনক ব্যাপার। কেবল ভগবৎ-সেবা সম্বন্ধে সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সেইরকম অনুশীলন করা এটিই আমাদের সর্ব্বোত্তম জীবন।

এমনি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝতে পারি যে, দেশের স্বার্থই বর্ত্তমানে সব চাইতে বড়; অন্ততঃ সাধারণে এটাই বলেন ও বুঝেন। কিন্তু দেশের স্বার্থে যারা নিজেরা কালোবাজারী করেন, সেটাও যেমন খারাপ তেমনি ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করে দেশের production (উৎপাদন) বন্ধ করা এটাও দেশের

পক্ষে খারাপ। দেশের স্বার্থে সকলে তার যথাযথ শক্তি নিয়োগ করলে পরেই সেটির দ্বারাই দেশের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল সাধন করা হবে। এই দেশকে আমরা ধরছি, দেশ হচ্ছে স্বর্থের একটু বৃহত্তর পরিচয়। 'দেশের সঙ্গে দেশের সংঘাত,—এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ বস্তু ঈশ্বরের সেবার জন্য নূতন জীবন লাভ করতে হবে, এটাই হচ্ছে সেবা অর্থাৎ শুদ্ধ সেবা। সেই সেবাময় জীবনই কল্যাণপ্রদ। এই সেবা কষ্টকর নয়, শুধু কর্ত্তব্যবোধে সেবা করতে হয় যাতে আনন্দ নেই তা নয়। এই সেবা চরমে এমন অবস্থা লাভ করতে পারে যে এর তুল্য আর কোন সুখ নেই যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়।

সুখের অন্বেষণ আমরা সকলেই করছি, "দুঃখ হত্যৈ সুখায় চ"—দুঃখকে নাশ করে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর, স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সুখের জন্য এবং দুঃখ বর্জনের জন্য একটা struggle (যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব) চলছে। এই struggle (যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব) মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা উপর থেকে আসছে সেই অনুসারে চলা, মুক্ত ভূমিকা হতে আসে সুতরাং তাকেই অনুসরণ করে চলা। আর একটা হচ্ছে এখানকার পারিপার্শ্বিকতা, অবস্থা ও নিজেদের বুদ্ধি থেকে উদ্ভুত একটা পন্থা। একটা deductive (বিয়োগ) আর একটা inductive (যোগ); একটা descending (অবরোহ) আর একটা ascending (আরোহ)। আমাদের সীমিত বুদ্ধির জগৎ

ছাড়াও আর এক অতীত প্রদেশ আছে এবং সেখানে সবই ভাল এরূপ শ্রদ্ধার সাহায্যে এবং বিশ্বাসের সাহায্য সেই উপর থেকে নেমে আসা জ্ঞান আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই এবং এর মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এইটি একটি দল বুঝতে পারেন। এই দল শ্রৌতপন্থায় নিজেদের মঙ্গল অন্বেষণ করেন। আর এই জড় জগৎ থেকে উদ্ভুত মনীষার সাহায্যে যারা মঙ্গল অন্বেষণ করেন সে আর একদল।

আরোহ পন্থী ও অবরোহ পন্থী এই দুটি দল দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে যারা আরোহ পন্থী অর্থাৎ inductive method-এ এখান থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে থাকেন তাদের বুদ্ধি বিচার যে খুব সীমাবদ্ধ তা অতি সহজেই বোঝা যায়। আর উপর থেকে অর্থাৎ যা নিত্য ভূমিকায় আছে এবং সেখান থেকে আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত, সাহায্যের জন্য নামিয়ে দেওয়া হয় সেইটিই প্রকৃতপক্ষে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক। এইটি যারা বুঝতে পারেন তারা অবরোহ পন্থী। কিছু কিছু লোক বহু অভিজ্ঞতার ফলে এখানকার অসারতা অযোগ্যতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং শ্রদ্ধা সুকৃতির সাহায্যে, বিশ্বাসের সাহায্যে সেই অনুসারে চলে তার ফল পান।

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণের কাছে—"হে প্রভু, ধর্ম্মের নামে জগতে এতকিছু আছে, বহু রকমের ব্যাপার চলছে এর কোনটি ঠিক কোনটি ঠিক নয় তা যার তার বোঝবার ক্ষমতা নেই, তুমি যদি কৃপা করে কিছু উপদেশ কর।"

কৃষ্ণ বললেন—"প্রলয়ে কিছুই ছিল না, নতুন সৃষ্টি হলে পরে আমি ব্রহ্মাকে ধর্ম্মের কথা বলি এবং এর বিষয়বস্তু আমিই। আমিই সত্য মূল বস্তু, উদ্দিষ্ট বস্তু, সকলের আমাকে পেলেই সব পাওয়া হয়ে যায়।" গীতায় ভগবান্ বলেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এমন জিনিষ থাকতে পারে যে, সমস্ত বাদ দিয়ে যাঁকে লাভ করলে সব পাওয়া হয়ে যায়। বেদেও বলা হয়েছে—

যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি॥

শ্রৌত সিদ্ধান্তের মূল কথা এই,—এমন আশা-ভরসা দেওয়া হয়েছে যে একটা জিনিষ জানলেই সব জানা হয়ে যাবে, একটা জিনিষ পেলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে। সেই তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব কৃষ্ণ। তিনিই বলছেন—"আমিই সেই বস্তু অর্থাৎ ধর্ম্মের বিষয়। কিন্তু আমার নিকট থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নিকট থেকে তাঁর শিষ্যগণ, সেই শিষ্যগণ থেকে পরবর্ত্তী শিষ্যগণ, এরূপভাবে শিষ্য থেকে শিষ্যগণের মধ্য দিয়ে এই ধর্ম্ম পারম্পর্য্য ক্রমে অবতীর্ণ। সে সব আবার এই পরম্পরা ও প্রকৃতি বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে বহুরকমের হয়ে দাঁড়িয়েছে; আবার এর মধ্যে বিভেদও দেখা যায়।"

আর এখানকার যে পাষণ্ডমত fossilism (জীবাশ্ম) থেকে ক্রমশঃ evolution (ক্রমবিকাশ), প্রথমে প্রাণী তারপর মানুষ, আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এইসব বাক্যের কদর্থ করে যা হচ্ছে, তার দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য ভগবান কখনও কখনও নিজে কখনও নিজের জন পাঠিয়ে সকলকে revive (অভ্যুত্থান) করেন, বিশেষ করে যখন নানারকম সংঘাত দেখা দেয়, নানারকম বিপর্যয় হয়। সাধারণ লোক বুঝতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্র বা সাধুর মারফতে বা শাস্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ শ্রীমদ্ভাগবতে এটা আমরা দেখতে পাই এবং সুধীগণ বুঝতে পারেন। ভগবানও গীতায় বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তাই দেখি শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিযুগে, আর শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ হয়ে পরস্পরের যোগাযোগে একটা অদ্ভুত পন্থার আবির্ভাব হয়েছে, যে একমাত্র ভগবানের নামানুশীলনের দ্বারাই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে বা সর্ব্বার্থ লাভ হতে পারে। কেবল শব্দানুশীলনের দ্বারা, কিন্তু সেই শব্দ—'শব্দব্রহ্ম'। শব্দব্রহ্মের অনুশীলনের দ্বারাতেই, হরিকীর্ত্তনের দ্বারাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে।

কলের্দোষনিধেরাজন্ অস্তি হ্যেকো মহানগুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

—"কলি সমস্ত দোষের বটে, তথাপি হে রাজন! কলির একটি মহাগুণ এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা জীব মায়াবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ পরতত্ত্ব লাভ করে।"

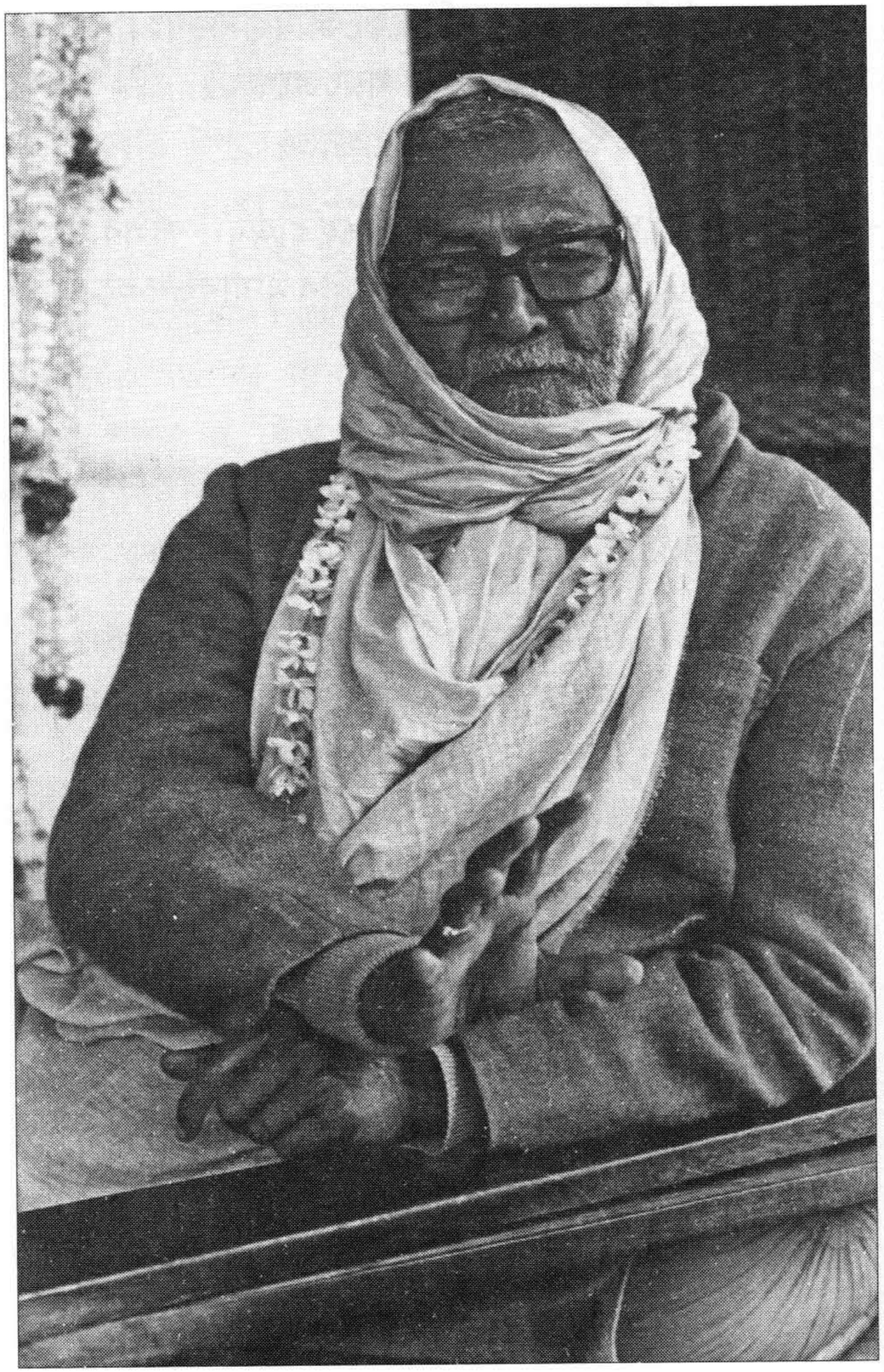

বন্ধন মুক্তির উপায়

এই পৃথিবীতে আমরা বাস করছি, অসংখ্য জীব বাস করছে, কিন্তু সবাই বেঁচে আছে কেমন করে এটা যদি চিন্তা করতে যাই তাহলে দেখব এখানে বেঁচে থাকা মানেই শোষণ করা। শোষণ না করে কেউ এখানে বাঁচতে পারে না। ঋষিগণ এই শোষণের কথা বলে গেছেন। শোষণ ছাড়া এখানে অস্তিত্ব থাকবে না— "জীবো জীবস্য জীবনম্"। এখানে একে অপরকে খেয়েই বেঁচে আছে। একটা দেহ বাঁচানো মানে লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা করা। কিন্তু আবার বলা হয়েছে যেমন কর্ম্ম করছি ঠিক তেমনি ফল পেতে হবে। নিউটন সাহেব বলেছেন— "For every action there is an equal and opposite reaction." আদর্শের দিক দিয়ে ছোট বড় নেই। আমি আজ যাকে খাচ্ছি, সেও একদিন আমাকে খাবে। এই হল আইন জগতের। অবিচার নেই প্রকৃতির রাজ্যে। তাই এই যে শোষণ করা হচ্ছে তা পুরোপুরি শোধ করে দিতে হবে। এই শোষণের জন্যই জীব অনাদিকাল থেকে নাগরদোলার মত উপরে যাচ্ছে আর নীচে নামছে। শোষণ করছে আর ভারী হচ্ছে, ঋণভারে ভারী হয়ে নীচে নামছে, automatically একেবারে computer method এ ব্যবস্থা, না করবার জো নেই। আর নীচের যারা

তারাই উপরে যাচ্ছে ও শোষণ করছে ফলে নীচে নামছে। হাল্কা হচ্ছে উপরে যাচ্ছে আর ভারী হচ্ছে নীচে নামছে।

সুতরাং এই যে অবস্থা, এই দুষ্ট চক্র থেকে বেরুবার উপায় সম্পর্কে যখন চিন্তা করতে যাব তখন উপায় বলে দেবেন গীতা। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

—অর্থাৎ ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না আর তা না হলে নিজের ভোগের জন্য যে কর্ম্ম তাই এখানে বাঁধবে, action reaction-এর বাঁধনে পড়তে হবে। তবে সেই যজ্ঞেশ্বর হরি অর্থাৎ Infinite (অসীম)-এর সঙ্গে conncet (যুক্ত) করে যে কাজই করিনা কেন, সেই কর্ম্ম আর বাঁধতে পারবে না। যেমন একজন পুলিশ যদি সরকারের স্বার্থে দশটি লোককে মেরে ফেলে তাহলে তার কিছু হবে না কিন্তু নিজের স্বার্থে যদি একটি লোককে সামান্য প্রহারও করে তাহলে তাকে এরজন্য শাস্তি পেতে হবে।

এখানে তুমি নিজের স্বার্থে কিছু করো না, তুমি as an agent of the Absolute এইভাব নিয়ে as a member of the whole সেইভাবে নিজেকে connect করে সেই অনুভুতিতে সব কাজ কর। নিজের selfishness (স্বার্থপরতা)-কে sacrifice (সমর্পিত) কর তা হলে তোমার যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মের ভাল মন্দ তোমার মালিকের কাছে চলে যাবে—সেখানে

সব adjustment (সমন্বয়)-এর ব্যবস্থা আছে। এই একমাত্র উপায়—connect with Infinite, Absolute এর সঙ্গে connection থাকা চাই। গীতায় বলছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

ভগবান বলছেন অর্জ্জুনকে,—'তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে সকল কর্ম্ম কর যা কিছু আহার কর, যে যজ্ঞ কর, যে দান কর, যে ব্রতাদি কর, সে সমস্ত আমাতে যে ভাবে অর্পিত হয় সেরূপে কর। আমাকে ফলটা অর্পণ কর, কাজের মালিক তুমি, ফলের মালিক তুমি নও, ফলের মালিক আমি।' সুতরাং Absolute এর সঙ্গে connection করে কাজ করলে সেই কাজের ফল তোমাকে বাঁধতে পারবে না। গীতায় ভগবান এই বলেছেন, আর এই কথাগুলো খুব শক্ত নয়, বোঝা যায়।

ভগবানের agent রূপেতে তুমি সব কর। তুমি তাঁর সেবা করবে তাই তোমার খাবার প্রয়োজন আছে; তুমি সে ভাব নিয়ে কর, তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ কর। Absolute world এর একটা member হয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন কর এবং নিজের যেটুকু দরকার সেটুকু নাও তাঁর ভাণ্ডার থেকে। আর এইভাবে করলেই তোমাকে পাপের ফল ভোগ করতে হবে না। তুমি যে জীব হত্যা করছ, যেমন লতাপাতা শাকসজী গ্রহণ করছ এগুলিরও প্রাণ আছে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে সেগুলো যখন ব্যবহৃত হবে তখন সেগুলি নষ্ট হবার জন্য কোন

পাপই হবে না, কারণ সকলের একটা সম্বন্ধ সেখানে অর্থাৎ centre-এর সঙ্গে আছে। তিনি হচ্ছেন পরতত্ত্ব তিনিই ভোক্তা। জার্মান philosopher হেগেল সাহেব বলেছেন—'Reality is by itself and for itself' সবই তাঁর জন্য; তা নাহলে বাস্তবতা হয় না। পরতত্ত্ব হতে গেলে পরম কারণ হতে গেলে তাঁর এ দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে—'By itself' এবং 'For itself'। 'By itself' হচ্ছে তিনি নিজেই নিজের কারণ'। তাঁকে যদি কেউ জন্ম দেয় তাহলে যে জন্ম দিয়েছে সে বড় হয়ে যাবে। অতএব যদি তিনি মূলবস্তু হন তাহলে তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে আছেন অর্থাৎ স্বয়ম্ভু বা eternal। আর একটি হচ্ছে 'For itself' অর্থাৎ 'তিনি নিজের জন্যই আছেন।' তিনি যদি অন্য কারো জন্য হন তাহলে সে বড় হয়ে যাবে। তাই তিনি সবকিছুর বড়, আর সবকিছু তাঁরই জন্য। গীতায় বলেছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

অর্থাৎ 'সবকিছু আমারই জন্য আমিই সবকিছুর ভোক্তা। আর আমিই সকলের প্রভু, তোমরা আমার দাস। আমিই 'one whole Absolute' জীব যখন এই understanding এ পৌঁছায় যে ভগবানই সবকিছুর ভোক্তা ও মালিক—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

অর্থাৎ ভগবান্ পরতত্ত্ব বা controller (নিয়ন্তা) হয়েও 'সুহৃদং

সর্ব্বভূতানাং' সকলের বন্ধু স্থানীয়, সকলের শুভাকাঙ্খী তখন সে শান্তি লাভ করতে পারে। কেননা power তোমার নিজের হাতে না থাকলেও একজন সৎলোকের হাতে থাকলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার যেহেতু সৎ এবং শুভাকাঙ্খী রাজার প্রজারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, কারণ তিনি power-টা যথাযথ বিবেচনা করে ব্যবহার করবেন। সুতরাং এইটি বোঝাবার চেষ্টা কর যে, ultimate power ultimate reality is friendly to all. আমরা নিজেদের হিতাহিত যতটা না বুঝি তিনি ততখানি বুঝে সেই হিত করবার জন্য ব্যস্ত। এইটে বুঝতে পারলেই আমাদের উদ্বেগ চলে যাবে, তখন মনে হবে চিন্তা কি মূল মালিক যার ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে তিনি আমার বন্ধু, আমার ভয়ের কি আছে, আমার কোন অনিষ্ট হবে না। সুতরাং এই অবস্থায়ই চিত্ত প্রকৃতপক্ষে শান্তি পেতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, মনকে সেই স্তরে নেওয়াটা কি করে সম্ভব হবে। এবিষয়ে অনেক calculation করে মোটামুটি এটা বলা হয়েছে যে, 'association is the best and most forceful think to convert.' সঙ্গগুণের প্রভাব আমরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করি। যখন কোন ঔষধে কাজ করছে না তখন মানুষ change-এ যায়, সেখানে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সেখানকার জলবায়ুতে শরীরটাকে ভাল করে দেয়। আমি হয়ত বুঝতে পারছি না কিন্তু সেখানকার আবহাওয়াই আমাকে ভাল করে দেয়। তেমনি good association, যেখানে সেরকম ভাবের চিত্তবৃত্তি আছে সেই

atmosphere-এ নিজেকে ফেলতে হবে, ফেললে পরে সেই জিনিষ automatically আসবে, association-এর প্রভাবে আমার পরিবর্ত্তন ঘটবে। আমার যেসব খারাপ দিক যেমন—স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি সবই সেই ভাল ভাবের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ময়লা জল ভাল জলের সঙ্গে মিশে ভাল হয়ে যায়। তাই সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র এই দুইয়ের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র খুবই powerful জিনিষ। যে এই দুটি জিনিষকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে তার পক্ষেই নিজের ভুল সংশোধন করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আর তা না হলে মনকে বশে আনা খুবই কঠিন। গীতায় শ্রীভগবানকে অর্জ্জুন বলছেন 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্' অর্থাৎ মন স্বভাবতই চঞ্চল, এই চঞ্চল মন স্থির করা খুবই কঠিন। এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন—, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে,' অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ মত পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের দ্বারা সেই মনকে বশীভূত করা যায়।

আমাদের যে পরিবর্ত্তন ঘটে অর্থাৎ আমরা কিছু গ্রহণ করি তা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে আমরা দেখতে পাই, পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন—আমার পুঁজি এই পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক; এরই মধ্য দিয়ে আমরা কিছু লাভ করতে পারি। সেগুলিকে কিভাবে utilise (ব্যবহার) করলে

পরম মঙ্গল লাভ করব, আমার সাতদিন মাত্র পরমায়ু, কৃপা করে আপনি বলুন। আমি কি করে এগুলির best utilise (সর্ব্বোত্তম ব্যবহার) করতে পারি যাতে আমার প্রকৃত কল্যাণ হয়। তার উত্তরে শুকদেব বললেন সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত। বড় বড় ঋষিরা সকলে চুপ করে শুনলেন। সাতদিন অনবরত চলল ভাগবত কীর্ত্তন। এই ভাবেতে জবাব সব দেওয়া আছে, সে সব আলোচনা করতে হবে।

মানুষ জন্ম পেয়েছি আমরা মরে গেলে যে মানুষ হব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কোথায় যে posted হব তার কোন ঠিক নেই। কেননা আমাদের ভেতরে কত রকমের আশা, আকাঙ্খা ও সংস্কার রয়েছে, কত সব কাজ করেছি সে সব সূক্ষ্মভাবে সুরক্ষিত আছে, আর সে সব বাসনা অনুযায়ী আমাদের জন্ম হবে।

সুতরাং মানুষ জন্মেই নিজেকে একটু help (সাহায্য) করা যায়। এই জন্মে যে independence (স্বাধীনতা) পেয়েছি, যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে তার সদ্ ব্যবহার করি তাহলে হয়ত এমন হতে পারে যে এই ভাল কাজের দ্বারা আমি এমন অবস্থায় যেতে পারি যেখানে পূর্ব্ব কর্ম্ম ফল আর ভোগ করতে হবে না। সেগুলি সব ভেতরেই suppress করা যায়, ধ্বংস করা যায়।

সুতরাং শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলছেন মনুষ্য জন্মকে পশু জন্মের মত ব্যবহার করতে যেয়ো না। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন সব জন্মেই পাওয়া যেতে পারে। কুকুর রাস্তায় ঘুমিয়ে যে সুখ পাবে তুমি ভাল বিছানায় ঘুমিয়েও সে সুখ পাবে না।

শূকর বিষ্টা ভোজন করে যে তৃপ্তি পাবে, তুমি পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেয়েও সে তৃপ্তি পাবে না। সুতরাং এগুলি যেখানে যাবে সেখানেই পাবে, কেউ কেড়ে নেবে না। কিন্তু তোমার eternal life (শাশ্বত জীবন) এর যে চক্র চলছে তার থেকে বেরিয়ে আসবার ব্যবস্থা এক এই মনুষ্য জন্ম ছাড়া আর কোন জন্মেই সম্ভব নয়। অতএব এই মনুষ্য জন্ম পেলেই তোমার সেই eternal life এর solution (সমাধান)-এর জন্য যা করণীয় তাই করবো এই ভাবে জীবন ধারণই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। আর যদি না করলে যে chance (সুযোগ)-টা তুমি miss (হারালে) করলে তাতে suicide (আত্মহত্যা) করা হল। এই valuable (মূল্যবান) মনুষ্য জন্মটা পশুর কার্য্যে দেওয়া মানেই সোনা দিয়ে গর্ত্ত বোঝাই করা, এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে।

অতএব দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মে নিজের যে কৃতকর্ম্ম সেগুলি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ও শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন। স্বপ্নেতে যে দেহ দেখি সেরকম জগৎ আছে, seperate system (পৃথক ব্যবস্থা) যা খুশী ইচ্ছামত অরাজকতা করা চলবে না। এখানের চেয়েও ভাল 'systematic Govt.,' যেখানে বিচার হয়। আমাদের দেহটা তো একটা খোসা পড়ে থাকে এখানে, party তো সেখানে। আসল চেতন যে অনুভূতি, যা সুঃখ অনুভব করছে সেটাতো সেই সাত্ত্বিক দেহের ভেতরে আছে। আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি এই চেতনার দ্বারা। আমাদের ভয় দুঃখের। সুখ চাই আর দুঃখকে এড়াতে চাই। দুঃখর

solution (সমাধান) টা আমরা চাই। স্বপ্ন দেহের মনের মধ্যেই চেতন থাকে, সেইটিই বেরিয়ে যায় আর এখানে ওখানে গিয়ে দুঃখ ভোগ করে।

এখন এই যে দুঃখ একে এড়াবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করতে হবে, নিজের গরজে এসব অনুসন্ধান করতে হবে। নিজের solution নিজে না করলে কে করে দেবে। গীতায় ভগবান বলছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আমরা নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই নিজের শত্রু। নিজে নিজেকে সাহায্য না করলে নিজের শত্রুতা করা হল, আর যদি সত্যি সত্যি সাহায্য করা যায় তাহলে মিত্রতা করা কল। ছেলেবেলায় পড়াশুনা না করে খেলাধুলা, এদিকে সেদিক ঘোরাফেরা করতে থাকলে অভিভাবক বা পিতা বলেন—'এখন এসব ছেড়ে দিয়ে একটু লেখাপড়া কর, কাজকর্ম্ম শিখ।' তেমনি ঋষিগণ বা ধর্ম্মীয় পিতাগণ বলছেন যে,—'এমনি স্ফূর্ত্তি করে সময় কাটিও না, নিজের ভেতরে অনেক সমস্যা আছে। যা তুমি চাওনা সেগুলি আসছে, সুতরাং সেগুলির প্রতিবিধান কর। বাইরের স্ফূর্ত্তিতে মেতে মূল্যবান সময় নষ্ট করো না। দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হবে এই জীবনেই। যে জ্ঞানেতে আছি 'fourth dimension'-এর জগতে, একে অতিক্রম করে আরো অনেক জিনিষ আছে সেসব বুঝবার

জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এই হল কথা আর তা না করে কানে একটা ফুঁ নিয়ে যে যেরকম ছিলাম সেরকমই থাকলাম সেটা কোন কথা নয়।

বৈষ্ণব জীবনে আনুগত্য

আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ করে প্রভুর আশ্রিত পশুর মত থাকতে হবে। পশু দুধ দেয়, ফসল দেয়, কিন্তু এসবের মালিক সে নয়, মালিক হলেন তিনি যাঁর আশ্রয়ে সে আছে। আমরা মালিকের behalf (পক্ষে)-এ কাজ করব। আর যদি তা না করি, তাহলে কর্ম্মের ফল অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমন হবে, যা করছি অনাদিকাল, থেকে।

তাই দেখছি, সত্যিকারের নিষ্কৃতির কথা বলছেন বৈষ্ণব। ত্যাগের কথা বলছেন বুদ্ধ শংকর, কিন্তু ভক্তিহীনতায় পরম পদ তাঁরা লাভ করতে পারেন না। ভাগবতে (১০।২।৩২) বলা আছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ ভক্তিহীন জ্ঞানী জীব নিজেকে খুব বিমুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধ চিন্তার মধ্যে থেকে তার উপরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা অগ্রাহ্য করার জন্য সেই বিচারে গলদ থেকে

যায়; তার ফলে বহু কষ্টে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গিয়েও, তার উপরে ভক্তির current (প্রবাহ) ধরতে না পারায়, আবার নীচের দিকে নেমে যেতে হয়; আর ঐ জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে পড়তে হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝতে হলে ঐ ব্রহ্মলোকের উপরে যেতে হবে। আমরা পাচ্ছি ভোগের রাজ্য, ত্যাগের রাজ্য আর সেবার রাজ্য; তাই ভোগ্য জগত থেকে ত্যাগের জগতে যেতে হবে, তবে ত্যাগে সমাধিস্ত হয়ে থাকলে চলবে না, উপরের দিকে সেবার current (প্রবাহ) আছে তাকে ধরতে হবে। তাহলে সেবাটা কিরকম সেটাই বুঝতে হবে। সেবা হচ্ছে, তিনি ইচ্ছা করবেন আর আমি পালন করব; ইচ্ছার মালিক তিনি, প্রয়োজনানুসারে তিনি বলবেন আর আমি অবিচারে তাঁর ইচ্ছা পালন করে যাব। এইরকমের জগতই হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগৎ। সেখানে একজনই মালিক, তিনি হুকুম করছেন আর সব আদেশ পালন করছে। এই যে সেবা তা একটু হিসেব নিকেশ করে, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য নিয়ে করাটা হল বৈকুণ্ঠের ব্যাপার, আর তারও উপরের প্রকোষ্ঠ গোলক, সেখানে কেবল অনুরাগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেবা, কোন হিসেব নিকেশ নেই automatic (আপনা আপনি) সেবা শুধুই অনুরাগ, না করলে ভাল লাগে না, করলেই ভাল। এই অবস্থা হচ্ছে গোলকে। এখন কি করে এ অবস্থায় যাওয়া যায় সেটা দেখা যাক। এ সম্পর্কে মহাপ্রভু বলছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

দীক্ষা হচ্ছে দিব্যজ্ঞান, অর্থাৎ তুমি সেব্য আমি সেবক, তুমি পুরুষ আর সব প্রকৃতি তাই তাদের কাজই হচ্ছে মুক্তাবস্থায় সেবা করা। তিনি ইচ্ছাময়, যা ইচ্ছা করবেন তাই আমরা পালন করব, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব যেহেতু আমরা slave। মহাপ্রভু বলেছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

এখন সাধুসঙ্গে থেকে কৃষ্ণসম্বন্ধ ভেতরে জাগ্রত করাই আমাদের কাজ। সেখানে কি? সেখানে তিনি প্রভু আমি দাস। আমার ধর্ম্ম সেবা করা, তাঁর ধর্ম্ম সেবা নেওয়া। তিনি সুখ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। সেবার দ্বারাতেই সেই উৎকৃষ্ট ধরণের আনন্দ পাওয়া যায়। সেবার মাধ্যমেই তাঁর কৃপালাভ হবে তাতে সুখ স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ প্রভুর আনন্দ সঞ্চারিত হতে পারে যা ভোগের দ্বারা সম্ভব নয়। ভোগ হচ্ছে নিম্নস্তরের

জিনিষ, জড় জগতের জিনিষ, আর ত্যাগের দ্বারাতে ঐ মাঝামাঝি মুক্তির অবস্থা কিন্তু এর পরে হল গিয়ে ভক্তি রাজ্য। শ্রীমদভাগবতে (৬।১৪।৫) আছে—

মুক্তানামাপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥

অর্থাৎ কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্ত মুক্ততো বটেই উপরন্তু সে ভগবানের সেবানন্দেতে বিভোর থাকে।

সুতরাং সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে তাঁর দাস্যে বাস করে নিজের বিচার জবাব দিতে হবে। নিজের মনকে তখন বলতে হবে যে, তোমার কথা বহুকাল শুনেছি এখন আর শুনব না, এখন বৈষ্ণব গুরুর দাস হয়ে তাঁর কথা শুনব, তিনি যা বলবেন তাতেই আমার কল্যাণ হবে। আমি তাঁর সেবা করব, আদেশ পালন করব, এটা যখন মনে হবে তখনই সত্যিকারের জীবন আরম্ভ হবে, বৈষ্ণব জীবন। 'ভৃত্যস্য ভৃত্য' হতে হবে, তবেই কিছু লাভের সম্ভাবনা। মহাপ্রভু বলেছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

আমি বর্ণ এবং আশ্রম এই চারিটির কোনটীর মধ্যেই নেই। আমি এর অতীত—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ'। এই অবস্থা সম্ভব কেমন করে, তাও বলেছেন মহাপ্রভু—

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

গোপীভর্ত্তা যে কৃষ্ণ, ভগবানের স্বয়ংরূপ তাঁর দাসের দাসের দাস হতে চাই, এই আমার পরিচয়। সুতরাং দাস্য জিনিষটা অনুশীলন করতে হবে, এবং সেটা যাতে কৃষ্ণদাস্য হয়, হরিদাস্য হয়, তার জন্য যিনি একান্তভাবে কৃষ্ণগত প্রাণ, এমন ব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে সেবা করতে হবে। সেবা না করলে সে লোকে প্রবেশ হয় না। ভিসা জাগাড় করতে হবে। পাশপোর্ট হলে দেশের বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু অন্য দেশে প্রবেশ করা যায় না, সে দেশের ভিসা ছাড়া। তেমনি বৈকুণ্ঠ জগতের ভিসা জোগাড় করতে হবে সেখানে প্রবেশ করার জন্য। মুক্তি হচ্ছে পাশপোর্ট স্বরূপ, এজগৎ থেকে মুক্তি, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশের জন্য সেবারূপ ভিসার প্রয়োজন।

তাহলে গুরুদাস্য বা কৃষ্ণদাস্য হচ্ছে নিজেকে নিবেদন করে সেই চাতকের মত হয়ে থাকা। রূপ গোস্বামী লিখেছেন—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তুয়তে চাতকেন॥

'হে প্রভু আমার প্রতি দণ্ডই কর বা দয়াই কর এ সংসারে তোমাভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই। বজ্রপাতই হোক

বা প্রচুর নবাম্বুধারা বর্ষণই হোক চাতক সর্ব্বদা মেঘেরই স্তুতি গান করে থাকে।'

কত সুন্দর উদাহরণ ! চাতক উভয় অবস্থায়ই এক রকম, সে শুধু চায় এককোঁটা উপরের জল, নীচের জল সে কখনও খাবে না সুতরাং এই ভাবেতে সেই দিকে লক্ষ্য করে চলবার চেষ্টা করতে হবে। আমার আর কোথাও গতি নেই, আশ্রয় নেই, যেখানেই যাব সেখানেই মরতে হবে, একমাত্র মৃত্যুকে অতিক্রম করে তোমার ধামেতে যেতে চাই, যেহেতু "যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম", অর্থাৎ যেখানে গেলে জন্ম-মৃত্যু, এই আসা-যাওয়া শেষ হয়ে যাবে। এটা বাস্তব জিনিষ, সখের জিনিষ নয়, যে আমি যতটা বুঝলাম তাই করলাম, তা হবে না।

গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়ে বাস মানেই সেখানে নিজের স্বতন্ত্রতা চলবে না। স্বতন্ত্র জীবন অনেক পেয়েছি, আর দুঃখও অনেক পেয়েছি; ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে ॥" নিজেকে ঠিক পথে চালিত করতে হবে, মনকে বলতে হবে যে, তোমার কথা শুনে জন্মজন্মান্তর অনাদিকাল হতে ঘুরে বেড়াচ্ছি. এখন আমি উপরের হুকুম শুনব, ভগবানের প্রেরিত হুকুম শুনব।" তোমার রসদ খাদ্য একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর না খেতে পেয়ে তুমি মরে যাবে—"সর্ব্ব মনোনিগ্রহ লক্ষনান্ত।" অদ্বৈতসিদ্ধির লেখক মধুসূদন লিখেছেন—"ততো ভবেৎ মনোনাশ," মনটা নষ্ট হয়ে যাবে।

মৌখিক পদ্ধতিতে যা হয় সেটা perfect নয়। সংকল্প বিকল্প মনের ধর্ম্ম। মন বলবে এটা চাই আবার বলবে এটা চাই না। এই যে কর্তৃত্ব, এটা আমাদের সর্ব্বনাশ করছে, ব্রহ্মাণ্ড ঘোরাচ্ছে, তার ভুমিকা দুষ্ট ম্যানেজারের ভূমিকা, বিদ্রোহী ম্যানেজারের ভূমিকা। আত্মা হল proprietor সত্বাধিকারী, কিন্তু minor proprietor, সে নাবালক, আর বিদ্রোহী ম্যানেজার মন, আত্মার behalf এ কাজ করছে। এখন অন্য একজন major proprietor এর সঙ্গে এই minor proprietor যোগাযোগ করে নিজের ম্যানেজারকে দমন করে position নিতে পারে নিজের সম্পর্কে।

সুতরাং আমাদের প্রাকৃত মন থেকে যা আসবে তা dismiss করে দিতে হবে, বলতে হবে তোমার কথা শুনব না, তোমার কথা বহু জন্মজন্মান্তর শুনে এসেছি, তোমার suggestion সে সব বিশ্বাসঘাতকতা, এর মধ্যে আমি নেই, আমি যাঁর আশ্রয়ে এসেছি তার কথা শুনব, তোমরা বিদায় দাও। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলেছেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এইসব প্রভুদের কথা আমি কতদিন, কতকাল, কতজন্ম যে শুনে এসেছি তার

কোন ঠিক নেই, এদের দুষ্ট নির্দ্দেশ হুকুম বহুকাল বহু জন্ম জন্মান্তর পালন করে এসেছি। তাদের এতসব কথা আমি শুনেছি তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হল না, আর আমার ও লজ্জা হল না তাদের দুষ্ট আদেশ শুনতে থাকলাম, কত ঘৃণ্য কাজ করলাম শুধু, ছিঃ ! ছিঃ ! কিন্তু সম্প্রতি আমি একটা বুদ্ধির প্রেরণা পেয়েছি, হে ঠাকুর ! হে যদুপতি ! আমি দেখছি যে, কোন প্রকারে যদি তোমার একটু চাকুরী, একটু সম্বন্ধ করতে পারি তাহলেই তোমার ভয়েই বেটারা পালিয়ে যাবে। তুমি যদি একটু তাকাও আমার দিকে তবেই আমি বেঁচে যেতে পারি, কারণ আমাকে তো তোমার মায়া মোটেই ভয় করে না, যদি তোমার একটু ঈশারা পড়ে তাহলেই মায়া আর আমায় কষ্ট দেবে না। গীতায় ভগবান বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভগবানের মায়া তাঁর কৃপাতেই ছেড়ে যেতে বাধ্য। মায়া জীবের চেয়ে বলবান কিন্তু ভগবানের অনুগত, তাই ভগবানের যদি একটু ঈশারা পড়ে তবেই মায়া সরে যাবে, আর তা নাহলে জীব যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক না কেন তাতে কিছুই হবে না। সুতরাং আমি দেখছি যে আমি নিজে এই ভোগ, ত্যাগ এসব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব না কিন্তু তোমার সর্ব্বসম্বন্ধই আমাকে বাঁচাবে, তাই আমায় যে করে হউক একট connection দাও, একটু কিছু কাজ দাও যাতে করে তোমার

সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয় যার ফলে মায়া আমায় ছেড়ে যাবে, আমি উদ্ধার পাব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধু গুরুর আনুগত্যই বাঁচার একমাত্র পন্থা, যেখানে আমার কোন ইচ্ছা চলবে না। সম্পূর্ণ যাঁকে বিশ্বাস করি, বৈষ্ণব বলে গুরুরূপে বরণ করেছি ভগবদাভিন্ন বিচার করে, তাঁকেই একমাত্র পথ প্রদর্শক করে তাঁর নির্দ্দেশেই পথ চলতে হবে। চাতকের মত অপেক্ষা করে থাকতে হবে কি নির্দ্দেশ উপর থেকে আসে আর সেইটিই মঙ্গল, এই বুঝে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। আনুগত্যের মাধ্যমেই উপরের জিনিষ আমার মধ্যে সঞ্চার হয়ে যাবে। কি নিয়ে আমাদের কারবার সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। গরুড় বচন আছে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ হাজার হাজার কর্ম্মকাণ্ডীয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ থেকে একজন সর্ব্ববেদান্তবিৎ যিনি জ্ঞান ভূমিকায় যজ্ঞ করছেন তিনি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান বিচারে জগৎ কিছুই নয় সব মায়া, সব নশ্বর, তাই এভাবে যে যজ্ঞ তা জ্ঞানবিচারে আত্মভূমিতে, যা সেই কর্ম্মভূমিকায় স্থূলবস্তু নিয়ে যজ্ঞের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ যেহেতু আত্মভূমিকায় সে নিজেকেই দিচ্ছে আহুতি। এরূপ কোটী

বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। কারণ বিষ্ণুভক্তের personal God কিন্তু বেদান্তবিৎ-এর impersonal ভাব। সোহং বলছে জ্ঞানী, অর্থাৎ সেই আমি, সেও চেতন আমিও চেতন। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রচেতন সে বৃহৎ চেতন, এটা দর্শন হলেই পুরুষোত্তমের কাছে মাথা নুইয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ব্রহ্মভূত হয়ে যাবার পর জীব পরাভক্তি লাভ করে। মুক্তির পর বেদান্ত আলোচনার দ্বারাতে এজগতের নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম হলে তারপরে আরো উপরে যিনি আছেন তিনি পুরুষোত্তম, তাঁর সেবায় যে মঙ্গল এটা বোঝা যায়। গীতায় আরো আছে—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যন্তে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

যখন ব্রহ্মেতে পরব্রহ্ম দর্শন হয় তখন মাথা নুইয়ে পড়ে। তেমনি এখানে বেদান্তে সব ব্রহ্ম কেবল চেতন. তারপর যখন পরব্রহ্মরূপে সেব্য দর্শন হয় তখন বিষ্ণুভক্ত হয়ে যায় আর সেই বিষ্ণুভক্ত কোটী বেদান্তবিৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। আর সহস্র সহস্র বিষ্ণুভক্ত থেকে ঐকান্তিক একজনই শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক মানে যাঁরা আইন কানুন না মেনেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। তাঁরা ভাল মন্দ কিছু জানে না বুঝতেও

চায় না, তিনি আমাদের প্রাণের দেবতা তাঁর সেবাতেই আমাদের পরম মঙ্গল এই জেনেই তারা সেবানন্দে বিভোর থাকে।

সুতরাং এইসব তাজা জিনিষ—এই কর্ম্ম ভূমিকা, জ্ঞান ভূমিকা ও ভক্তি ভূমিকা এইসব আলোচনা করে, বিচার করে, পালন করে আত্মোন্নতি করতে হলে গুরুদেবের অনুগত হতে হবে এবং এতেই দিব্যজ্ঞান লাভ সম্ভব হবে।

ধর্ম্ম শিক্ষা ও বিশ্বাস

বর্ত্তমান জগতে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা-সমস্যার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কোমলমতি বালক বালিকা হতে প্রত্যেক বয়ঃস্তরেই আস্তিক্য-শিক্ষার গুণে মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়তর্পনাদিই মনুষত্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রানুশাসিত ধর্ম্ম জীবনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। নতুবা জীবনের পশুস্তরেও যেটুকু কাণ্ডজান, দয়ামায়া, শৌর্য্য, বীর্য্য বা শালীনতা দেখা যায় মানুষ সেটুকু হতে ও প্রায়ই বঞ্চিত হতে বাধ্য। বিদ্যা বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ হলে ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বা ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকার ফলে জীব উশৃঙ্খলতা ও পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হয়ে চরম নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে। মনুষ্য জাতির দেশকাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মমত বিভিন্ন হলেও ঈশ্বর বিশ্বাস তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই পরিব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায় নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু বা বিষয়ের সম্মাননা যে প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত,

সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠের আনুগত্যে পূর্ণবিশ্বাস জীবগণকে বহুবিধ অবাঞ্ছিত দুষ্কৃতির হাত হতে রক্ষা করে। এর বহু প্রমাণ আছে। অতএব শিক্ষার সর্ব্বস্তরে যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পরিব্যাপ্তি ও মর্য্যাদাময় আসন সংরক্ষিত না হবে ততদিন প্রকৃত মনুষ্যত্ব তো দূরের কথা সাধারণ সৌজন্যও আমাদের আশার বাইরে থেকে যাবে। মহর্ষি বেদব্যাস হতে আরম্ভ করে সর্ব্বস্তরের সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ তাই বলেন—

কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

অতএব জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিধাপেই আস্তিক্যধর্ম্ম শিক্ষা বা ধর্ম্মানুশীলন প্রচেষ্টা প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিধিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আস্তিকতার দ্বারা আত্মোন্নতি বা পরমার্থ লাভ তো হয়ই তাছাড়া ব্যতিরেক ভাবে দুর্নৈতিকতা, উশৃঙ্খলতা, হৃদয়হীনতা ও অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি হতে স্বতঃই মুক্তিলাভ ঘটে থাকে।

সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বস্তরের মনুষ্যগণের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঈশ্বর বিশ্বাস মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আকর সত্যের অহৈতুক আকর্ষণ প্রভাবে জীবের চেতনবৃত্তির বিকাশের ক্রমানুসারে বিশ্বাসের তারতম্য বা ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বিশ্বাসে মানবগণের পরস্পরের দেহ ও মনের বিভিন্নতার দরুন তারতম্যের অবকাশে ভাব ও ভাষাভেদে ঈশ্বরের

বিভিন্ন সংজ্ঞা থাকলেও চিন্তা ও অনুভূতির পূর্ণ বিকাশে ভগবৎস্বরূপেই পরমেশ্বরত্ব দর্শন করে বিশুদ্ধসত্ত্ব আপ্তকাম মহর্ষি প্রবর জানিয়েছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

এ শুধু মাত্র কোন শ্রেণী বিশেষ মানুষের মুখের কথা নয়। এ সাক্ষাৎ সহজ ভক্তি সমাধি লব্ধ ধন। 'বৃহতের অভিমুখে অণুর অভিগমন' এই নিত্য সত্যের অনুশীলনের কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানও অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে। প্রকৃত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার বিশুদ্ধরূপ যা কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে পাই—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

সেই বিশ্বাসের অনুভূতিই জীবের প্রকৃত শোক, মোহ, ভয়াদি অপহরণ করে। কেন্দ্রীয় সত্যের অহৈতুক আকর্ষণে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের পুনঃ পুনরাবর্ত্তনে এই নিত্য সত্যের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তা সর্ব্বকালজ্ঞ দেবর্ষিগণের অনুভূতি লব্ধ লেখনী দ্বারা, প্রকাশিত, নাস্তিকতা বলে যা একশ্রেণীর মনুষ্যের দ্বারা প্রচারিত তা যে আস্তিকতারই বিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল সাময়িক প্রচেষ্টা বিশেষ, এটি আর বর্ত্তমানে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

যাহোক সর্ব্বস্তরের প্রাণীর বা মনুষ্যের যা যুগ যুগান্তরের

স্বভাবসিদ্ধ ধন, সেই বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র লাভের প্রচেষ্টাও যে জীবকে কত বড় সম্পদ প্রদান করতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও অতীত। তাই গীতার ভাষায় বলি—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

এত বড় নিশ্চন্ততার কথা, ভরসার কথা থাকতেও আমরা যে চিরকালের দুর্ভাগ্যের ধুর বহন করতে করতে হা হুতাশ করে জন্ম জন্মান্তর কাটিয়ে দিচ্ছি—এটি বড়ই আক্ষেপের, বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীশরণাগতি

ভগবদ্ভক্তিতঃ সর্ব্বমিত্যুৎস্বজ্য বিধেরপি।
কৈঙ্কর্য্যং কৃষ্ণপাদৈকাশ্রয়ত্বং শরণাগতিঃ॥

এই শ্লোকটি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতের। শরণাগতি বিষয়ক সর্ব্ব-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করে শরণাগতি কাকে বলে—তা বলা হয়েছে। ভগবানের ভক্তিতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধাতার কৈঙ্কর্য্য পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে একান্তভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়কেই বলে—শরণাগতি। ভাগবতেও আছে—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

সুতরাং "স্বজনম্ আর্য্যপথঞ্চ হিত্বা"। আর্য্যপথ পরিত্যাগ বড় সোজা ব্যাপার নয়। "উৎস্বজ্য বিধেরপি কৈঙ্কর্য্যং"—বিধাতার কৈঙ্কর্য্য বলতে বেদস্বরূপ যে ব্রহ্মা, তাঁরও আইনের গণ্ডীর বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রকৃত কৃষ্ণপাদৈকাশ্রয়ত্ব একে বলে। অতএব শরণাগতি একটা কল্পনা নয়। এত বড় জিনিষ, যে কিছু পেয়েছে তার কাছে সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। এমন জিনিষ আছে। সে জিনিষের সন্ধান যারা পায় তারা পরমার্থ

ভাণ্ডারের চাবিকাঠি নিয়ে বাস করে। শ্রীশুকদেব বলেছেন—"এতাবান্ সাংখ্য যোগাভ্যাং স্বধর্ম্ম পরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসাং অন্তে নারায়ণঃ স্মৃতিঃ।" কি জিনিষ নিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছ তোমরা? চাবিতো আমার হাতে। সাংখ্য, যোগ, স্বধর্ম্মপালন, নিষ্কামভাবে বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান এসবের দৌড় তো ঐ চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত, কিন্তু 'জন্মলাভঃ পরঃ পুংসাং.' অর্থাৎ হায়ার ফুল ফিল্মেন্ট অফ্ লাইফ্—'অন্তে নারায়ণঃ স্মৃতিঃ'। সুতরাং আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে চরমে সেই তিনিই মালিক। শ্রীভগবান বলেছেন—

তস্মাৎ তমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥

অর্থাৎ বেদ এবং তার থেকে পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে যা কিছু বহিরঙ্গ উপদেশ, বিধি নিষেধ দেওয়া হয়েছে সেই গুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে, কেননা বেদের মূল অভীষ্ট পরতত্ত্ব হলেন ভগবান, তাঁর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করতে বলাই বেদের চরম তাৎপর্য্য।

বেদ মানে উপদেশ। বেদ হচ্ছে কোন যুক্তির অপেক্ষা করে না এমন সব উপদেশ। ছোট ছেলেকে যেমন প্রয়োজন মত, তার মঙ্গলমত পরিচালনা করে অভিভাবক; আমি যা বলছি তাই কর; ডাইরেক্ট অর্ডার। এই হল বেদের লক্ষণ। বেদ হুকুম করবে, কোন যুক্তি দেবে না। পুরাণ বন্ধুভাবে বলবে, অন্যান্য শাস্ত্র তারা যুক্তি দেবে। কিন্তু বেদ বলবে এটা কর, ওটা কর।

তোমাকে বুঝতে হবে না। তুমি কতটুকু বুঝবে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক তোমার। প্রভুপাদ বলতেন—পাপী ব্রেন, কুকুরের ছানার মাথা। এই অনন্তের এক কণাও তোমার ঐ মাথায় ধরবে না। 'চোদনাং' মানে সেই বেদকে পর্য্যন্ত উৎসৃজ্য। 'প্রতিচোদনাং' মানে বেদ থেকে নিয়ে মনু প্রভৃতির বিচার যে লোকরঞ্জনের দোকান, সে সবও বাদ দাও। 'প্রবৃত্তিঞ্চ' 'নিবৃত্তিঞ্চ' মানে প্রবৃত্তি মার্গের যত কথা আছে; এবং নিবৃত্তি মার্গের যত কথা আছে; অর্থাৎ ভোগ এবং ত্যাগ রাজ্যের যত কথা আছে সব উৎসৃজ্য। 'শ্রোতব্যং' মানে ভবিষ্যতে অনেক শুনতে বাকী আছে; এখনো সব ভালভাবে আবিষ্কারই হয় নাই; প্রগতির যুগ এগিয়ে যাচ্ছে, শুনতে এখনো অনেক বাকী। 'শ্রুতমেব চ' মানে অতীতে যা শোনা হয়ে গেছে, সে সব এখন লুপ্ত। অর্থাৎ অতীতে অনেক কিছু বড় বড় ছিল, কিন্তু এই সব কিছুকেই সম্যক রূপে পরিত্যাগ করে—

'মামেকমেব শরণং আত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্'

একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। একটা কৈফিয়ৎ কেবল আমি দিচ্ছি, কি? না 'আত্মানং সর্ব্বদেহিনাং' সমস্ত দেহিগণের আত্মা। 'আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।" 'ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।' পার্টি একমাত্র আমিই। আমিই একমাত্র ভোক্তা। আর সব ভোগ্য। অর্থাৎ যখন অন্তর দিয়ে বোঝা যাবে ভোক্তা কেবল তিনিই, অচ্যুতেরই সব, আমরা সব শক্তির পরিবার। চ্যুত অভিমানের পাল্লায় দুদিনের

মালিকানা এ শুধু খোসার আত্মাভিমান। জগতের কোন জিনিষের মালিক কেউ নয়। আমার যেমন দেহ, চোখ, কান, নাক, ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির মালিক বসে আত্মা, সেই প্রকার আত্মার ভেতর বসে আছেন তিনি—মালিক পরমাত্মা। আমরা সব 'সুপার ভিসিএ্যাল এক্সজিষ্টেন্স'—সব খোসার দল। এই বিচার দৃঢ় হলে শরণাগতির আওতায় গিয়ে পড়বো। শাস্ত্রীয় সর্ব্বপ্রকার বিধি নিষেধের চাবিটি তখন হাতে এসে যাবে।

তখন শরণাগতি 'মামেকমেব শরণং' 'যাহি সর্ব্বাত্ম ভাবেন।' সর্ব্বপ্রকারে—কায়, মন, বুদ্ধি, বাক্য—যা কিছু আছে সব দিয়ে, সব নিয়ে শরণাগত হও। এই হল শরণাগতি। হে উদ্ধব! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, আমার আত্মা পর্য্যন্ত সব কিছুই তোমার। তাই তোমায় আমার এই চাবি কাঠিটি দিয়ে দিলাম। গীতায় অর্জ্জুনকে ঐ প্রকার বলেছেন, "প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" লোকে বোঝে না, বললেও বুঝবে না, আসল কথাটা হচ্ছে আমিই সব। রকমারী মনোহারী বাক্য-প্রদর্শনী, ধর্ম্ম, কর্ম্ম যেখানে যা কিছু দেখছ, সব শো বটল্। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে এই নগ্ন সত্যটা বলছি যে আমিই সব। আমার তৃপ্তি বিধানই হচ্ছে একমাত্র করণীয় একে বলে অদ্বয়জ্ঞান।

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য'—এখান হতে চ্যুত হয়ে ধর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, জপ কর, যোগ কর, ত্যাগ

কর,—যেমন "মুনয়োঃ বাতবসনা শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ" ইত্যাদি যাই কর কিছু সুবিধা হবে না। পয়ঃ পানকারী ব্রহ্মচারীকে মহাপ্রভু বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছেন। প্রহ্লাদও বলেছেন "নিগমস্য সারম"—যেখানে যা কিছু ধর্ম্মের কথা আছে সব 'স্বাত্মার্পণং' সব আত্ম-নিবেদনেই সার্থক। নিজেকে নিবেদন করাই হল যাবতীয় ধর্ম্মের সারকথা। 'আমি তো তোমার তুমি তো আমার' এর উপর যা কিছু সাজসজ্জা—সবই সুন্দর। সুতরাং যে সেটি বুঝতে পারল তার আর ভয় কি? তার দুনিয়াদারী, তার অভিমান সব খসে গেল। 'তৎপরত্বেন নির্ম্মলম' একটাই অস্ত্র। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ'। 'প্রপার্টি বিলংস টু কৃষ্ণ'। দুর্গা পূজাই কর, কালীপূজাই কর, সংকল্প করে যা কিছুই কর না কেন চরমে সেই "কৃতৈতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু"। মূল লক্ষ সেই একে গিয়ে শেষ। যতদিন সাধন চেষ্টাপর রয়েছে ততদিন তা আচারে থাকে, সিদ্ধ হয়ে গেলে অন্তরে গাঁথা হয়ে যায়। অন্য কোন বিচার সেখানে আসর করতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, পূজা, অর্চা সমস্তের শুদ্ধি বিধানের লিঙ্ক ঐখানে। আগ্নেয়গিরির ধূম যত দূরেই দেখ না কেন, আগুন থাকে তার গর্ভে।

'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"

অতএব "মর্ত্যো যদা ত্যক্তঃ সমস্ত কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে, তদামৃতত্বৎ প্রতিপদ্য মানো মমাত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।" এই "আত্মভূয়ায়' মানে হচ্ছে—

"দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম-সম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥"

কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর পাওনা। একটু বিস্মৃতি এলেই ভক্তের কাছে যেন প্রলয় হয়ে যাবে। একটু স্মৃতির এদিক ওদিক হলেই চমকে উঠবে—কি করছি? তাঁর সেবা ভুলে আছি? সময়কে কৃপণের ধনের মত আগলে রাখে। যেন ব্যর্থ না যায়। পুঁজি কমলেই সর্ব্বনাশ। শরণাগতির ডিগ্রি অনুসারে নিবেদিতাত্মার ডিগ্রিও বেড়ে যায়। 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং' এই ভাব লক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরাৎপরতত্ত্বের—লীলাকল্লোলবারিধি ভগবানের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-পরসেবা-বৈচিত্র্যসম্ভার এই শরণাগতির ভিত্তির উপরই যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

সেই শরণাগতির চরমপ্রকাশে দেখা যায়, "কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতামতিঃ" অতি সুদুষ্প্রাপ্য জিনিষ। ও কোথাও পাওয়া যায় না। অমূল্যধন কোটী কোটী জন্মের সুকৃতি দিয়েও কেনা যায় না। একমাত্র প্রকৃত রসবোধ—একমাত্র লৌল্যই

প্রাপ্তির কারণ। যে পেয়েছে, তার সবকিছু প্রাপ্তি হয়ে গেছে। 'রসভাবিতামতিঃ' রসিকশেখর তার সব কিছু হরণ করে নিয়েছেন। "চিত্ত কাড়ি' তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে যত্ন করি নারি কাড়িবারে।"

এ অতি অমূল্যনিধি। একি সহজে হয়! 'ন বৈ বিদুঃ ঋষয়ো নাপিদেবাঃ'। বড় বড় ঋষি—রিসার্চ্চস্কলার তাঁর কোন পাত্তাই পায় না। এই প্রকার ভক্তের চেষ্টা অলৌকিক। সমাজ তাঁকে পেয়ে ধন্য।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেও তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই রসভাণ্ডারের সন্ধান নিয়ে জীবজগতের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন—

"যদি, গৌর না হ'ত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রসসীমা
জগতে জানাত কে ?॥

মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥”

“শিব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইল লুটিয়া
বাজাইয়া করতালি ॥”

নিতাই গৌরহরি বোল !

জীবের স্বাধীন ইচ্ছার নিশ্চয়াত্মক স্বার্থকতা

ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়রূপ সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। কিন্তু তাহা জীবের সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা, ঈশ্বরের নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপ। তিনি জীবকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন না, কিন্তু তাহার স্বাধীন ইচ্ছার পথেও প্রতিবন্ধক হন না এবং অন্য এক ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহারই আদিষ্ট সাধুসন্তের এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সহায়তায় তিনি যে কোন প্রকারে তাঁর ভক্তকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করিতে, তাহাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। “আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, বৎসগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” ধর্ম্মগ্রন্থাদির মত বহু বিজ্ঞপ্তি আছে, বহু প্রতিনিধিগণও এই কার্য্যে রত রহিয়াছে। “গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” কিন্তু স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিও যে বিদ্যমান। সেই স্থানেই যত গোলোযোগ, কেহ কেহ নিরাশায় উক্তি করেন—কি ? কেন তিনি আমাদের এই বিপজ্জনক স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, যাহার প্রাপ্তিতে আমাদের নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতে হয় ? কি কারণে দিয়াছেন ? তিনি সর্ব্বদর্শী; তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আমরা এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার করিতে পারি

জানিয়াও কেন তিনি এইরূপ বস্তু আমাদের দান করিলেন। এই ইচ্ছাশক্তি দিয়া, প্রতিপালক যেন অবোধ শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র দিয়াছেন, যাহাতে সে নিজেকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তি হীন অস্তিত্ব তো জড়ের অস্তিত্ব,—জড়বস্তু। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি হইল এক অমূল্যধন। এবং তাহার সাহায্যে আমরা রসাস্বাদনে সমর্থ হই। জিহ্বা প্রদত্ত হইয়াছে—কেবলমাত্র তিক্তস্বাদ আস্বাদনের জন্য নহে, মিষ্টতা গ্রহণের জন্যও। রসাস্বাদনে অপারগ জিহ্বা কোনো সময়েই মিষ্টত্ব উপভোগ করিতে পারিবে না। আমরা অনুক্ষণ জিহ্বাকে কেবলমাত্র তিক্তবস্তু আস্বাদন করাই বলিয়াই ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করি।

তিনি কি কারণে আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন? আমরা যে সর্ব্বক্ষণ তিক্ত বস্তু সকলই আস্বাদন করিতেছি। কিন্তু তৎসঙ্গে মিষ্ট বস্তুর স্বাদ গ্রহণের জন্য ও জিহ্বার প্রয়োজন। সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বর অভীপ্সিত কার্য্যসাধনের জন্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন। আমরা কখনও কখনও তিক্তবস্তুর সংস্পর্শে আসি। তজ্জন্য কি আমরা সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষারোপ করিব? তিনি কেন দিয়াছেন? কোনো শ্রুতিকটু বাক্য কর্ণকে পীড়া দিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার উচ্ছেদ সাধনের কথা চিন্তা করিব না অথবা চক্ষু দ্বারা কখনও কোনো অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখিতে হয় বলিয়াই তাহাকে বিনষ্ট করিব না। আমাদিগকে চক্ষু প্রদান করা হইয়াছে এই কারণে, যে তদ্দ্বারা দিব্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ

করার সুযোগ হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের চক্ষুষ্মান্ করা হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তির অপসারণে আমরা প্রস্তরতুল্য হইব। অতএব স্বাধীন ইচ্ছাই সমস্ত বস্তুর সার, চরম নির্য্যাস। চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য বহু বস্তুসমূহও ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সত্তাও ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। উহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমরা প্রস্তরে পরিণত হইব। এবং তাহা কাহারও আকাঙ্ক্ষণীয় নহে।

প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি উজ্জ্বল দিক আছে, এবং তাহার জন্যই বস্তুটির সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। ইহার কুব্যবহারে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, ইহা সৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে আমরা সমৃদ্ধি লাভ করি। ইহাই প্রকৃত অবস্থা এবং আমাদের এখন ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বস্তু সমূহের উজ্জ্বলিত দিকটি অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইব, সকল বস্তুই কল্যাণপ্রদ। সকল বস্তুই মঙ্গলকর,—পূর্ণমাত্রায়। একমাত্র আপনাকে সেই ঊর্দ্ধতর স্তরে উন্নীত করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সমত্বের এবং পূর্ণ সুসঙ্গতির সন্ধান পাইব, সেখানে সবই আনন্দময়।

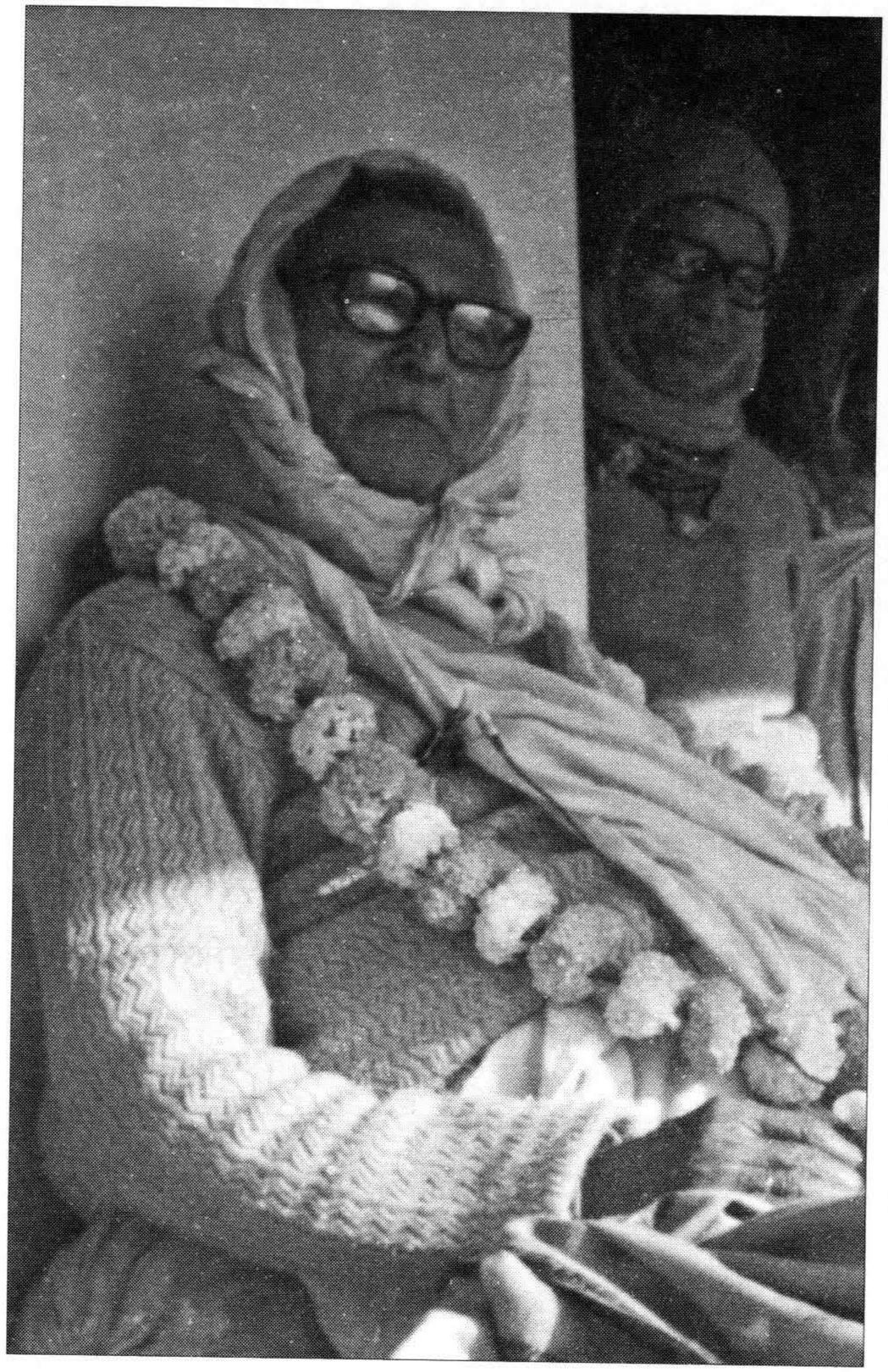

সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কৃপাদর্শনেই প্রকৃত সুখ লাভ

এজগতে আমরা প্রত্যেকেই সুখ-দুঃখের সম্মুখীন হই। এই সুখ-দুঃখকে সাধারণ মানুষ একভাবে গ্রহণ করেন, আর যাঁরা অসাধারণ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁরা আর একভাবে গ্রহণ করেন। কিভাবে গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে। এখন আমরা সেইটা আলোচনা করব।

সুখ-দুঃখ যাই আমরা পাই না কেন তাতেই বুঝতে হবে এর পেছনে 'Universal Backing' (পূর্ণতত্ত্বের সমর্থন) আছে এবং আমার কর্ম্ম হচ্ছে তার কারণ। যে 'Punishment' (শাস্তি) আমার উপর আসছে বাইরে হতে তার দাবী আছে আমার উপর, অর্থাৎ তা আমার পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেতেই আমার প্রাপ্য ছিল শুধু এই ভাবেতে নিলে হলো। গীতার কথা—খানিক উদাসীন হয়ে নেবে, ভাল-মন্দ বিচার করতে যাবে না, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমানভাবে নেবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

(গীঃ ২।৫৬)

আর শ্রীমদ্ভাগবতে আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ যাই আসুক না কেন সে সব সমান ভাবে মেনে নেওয়া নয়, অথবা কোন রকমে সহ্য করে নেওয়া নয়, ওতেই ভগবানের দয়া দেখতে হবে। তাঁর হাত ছাড়া তো কোন কিছু পাশ করে না, যা কিছু ঘটুক চরমে তাঁর ক্ষমতা আছে, তিনি ইচ্ছে করলে নাও করতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করছেন না। যে জিনিষটি আসছে তা আমার কর্ম্মানুসারেই আসছে। আমি আমার পূর্ব্ব কর্ম্মফল ভোগ করছি, এইটুকু জানলে পরে সকলেরই একটা 'Independent Authority' (স্বাধীন কর্তৃত্ব) স্বীকার করা হয়।

আর সম্পূর্ণ তাঁর অধীন, তাঁকে যদি বন্ধুর মত দেখতে হয় তাহলে সবকিছু তাঁর হাত দিয়ে Passed (অনুমোদিত) হয়ে আমার কাছে আসছে, সুতরাং নিশ্চয়ই এর মধ্যে আমার মঙ্গল আছে। এটিই বিশুদ্ধ বিচার।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

(ভাঃ ১০/১৪/৮)

প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে 'স্বরূপেন ব্যবস্থিতি' Positive Attainment' কেবল 'Negative Side' (নেতিবাচক দিক) থেকে মুক্তি সেটাকে মুক্তি বলছেন না 'Positive Attainment' এর (নিত্য, বাস্তব তত্ত্ব) লাইনে তোমার 'Internal Adoptability' (অন্তরের গ্রহণক্ষমতা) অনুসারে যেখানে 'Self Determination' (স্বরূপোপলব্ধি) চরম জায়গায় গেল, সেখানে পৌঁছালে তবে মুক্তি বলা যাবে। কেবল 'Negative Side' (অসৎ মায়িক দিক) থেকে 'Withdrawal' (প্রত্যাহার) নয়, 'Positive Side' এ সৎ, (বাস্তব তত্ত্বের দিকে) ঠিক তোমার 'Adjusted Position' (সামঞ্জস্যময় স্থান) যেটি তোমার স্বরূপে আছে, এইটে হলে পরে তবে তাকে মুক্তি বলে। এখন সেই মুক্তি লক্ষ্য করতে গেলে, সেই মুক্তি পেতে চায় কে? যে 'Adjustment in the position, Adjustment of the whole' (নিজের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য এবং সেই সঙ্গে সবটার সঙ্গে সামঞ্জস্য) তাতে দয়া দেখতে হবে, যাতে বিদ্বেষ নাই, ঔদাসীন্যও নাই, কেবল আমার কর্ম্মের উপর ফেলে দেওয়া নেই, প্রভুর হাত এতে আছে, স্নেহের হাত এতে আছে। আমার 'Guardian' (অভিভাবক) এর হাত আছে দেখতে হবে, এটা আমার মঙ্গলের জন্যে। তত্ত্বেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ... সুষ্ঠ সমীক্ষাতে দেখা যাবে এটা তোমার দয়া, ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্ ... যদিও এটা আমার পক্ষে খারাপ, আমার পূর্ব্বকর্ম্মের ফল ভোগ

করছি—এতেও দয়া শাস্তির মধ্যেও দয়া । মা ছেলেকে মারে—শোধন করবার জন্য, বিদ্বেষবশতঃ নয়, শোধন হোল লক্ষ্য, সুতরাং ছেলে যখন বলবে, মা আরো বেশী করে মার, আমি খুবই অন্যায় করেছি, তখনই মার বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ ছেলে বুঝেছে তার কল্যাণের জন্য মেরেছে, সুতরাং তখন মার 'Stop' (বন্ধ) হয়ে যাবে।

সুতরাং আমার মঙ্গলের জন্য, শোধনের জন্য তার শাস্তি এইটে বুঝতে পারলেই ঠিক 'Adjusted' (সামঞ্জস্য) হওয়া যায়, 'Higher Adjustment' is there (উচ্চ জাতীয় সামঞ্জস্য সেখানে) শুধু আমার নিজের বিচারে সব সুবিধা হবে এটাই নয়—আমার অসুবিধা গুলিও 'Universal' (অনন্তের) বিচারে যেটি হচ্ছে আমার প্রতি ব্যবহার, সেটাও আমার পক্ষে কল্যাণকর এইভাবে 'Positive' (নিশ্চয়াত্মিকা) দর্শন হলেই 'Adjustment' (সামঞ্জস্য) । শুধু খাতিরে বাইরের সঙ্গে মিল করে নিলাম প্রয়োজনেতে এই বলে নয় সেটা আস্বাদনযোগ্য—মধুর । তাঁর দেওয়া শাস্তি মিষ্টি লাগতে হবে, তিনি দণ্ড দিচ্ছেন তাঁর দণ্ড পায় কে ? দণ্ড পেয়েছি আমি ধন্য।

দণ্ড পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন অদ্বৈত প্রভু । মহাপ্রভু তাঁকে প্রাচীন বলে একটু গৌরব দেখাতেন । এজন্য তিনি শান্তিপুরে গিয়ে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন—ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়। একথা শুনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত প্রভুকে মার দিতে লাগলেন; তখন

সীতা দেবী এসে বললেন কর কি ! হরিদাস ঠাকুর একদিকে, আর নিত্যানন্দ প্রভু মজা দেখছেন—'এবার জব্দ হলে তো! এইবার দণ্ড দিলে তো! এতদিন শুধু আমায় বড় বলে বলে এসেছিলে; এবার তুমি বড় হলে তো!' এরকম দণ্ড পেলে ভাবতে হবে দণ্ড পায় কে ? দণ্ডটাও 'Reward' (পুরস্কার) বলে মেনে নিতে হবে। 'Universal wave' (অনন্তের তরঙ্গে) যা আসছে তাকে মেনে নিতে পারলেই তুমি সুখী হতে পারবে।

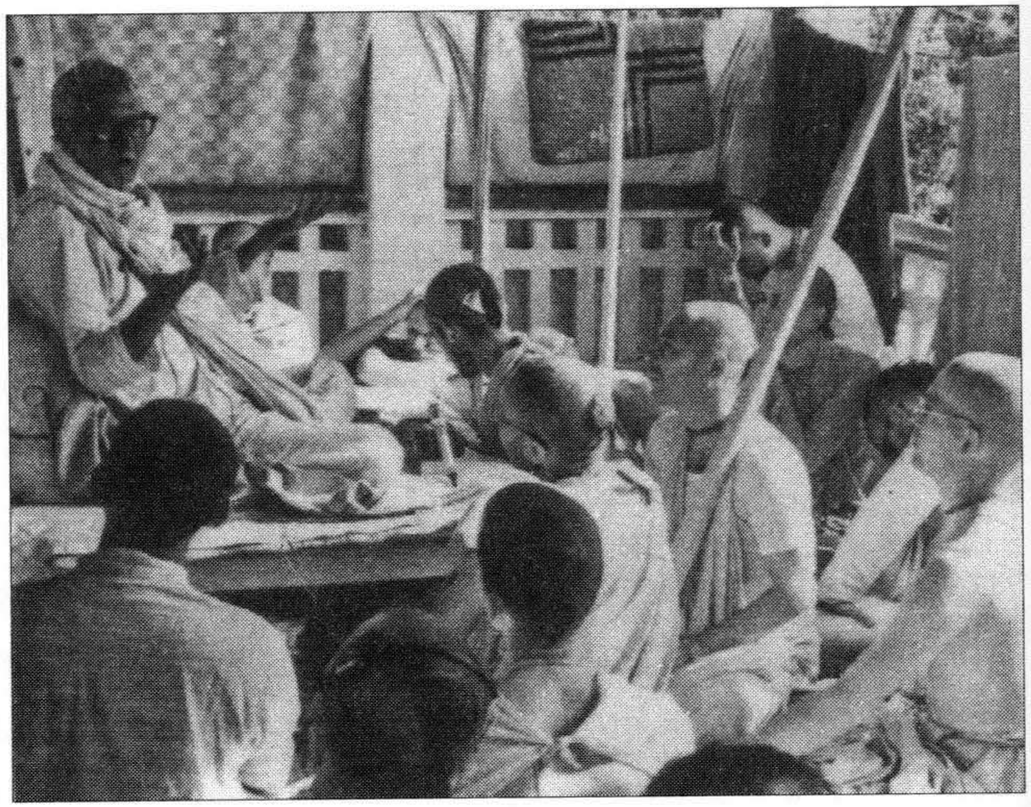

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

আমি সর্ব্বপ্রথম আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্নবিগ্রহ সতীর্থ বৈষ্ণবগণের বন্দনা করি এবং সভাস্থ সজ্জনবৃন্দকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আমার জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ আমার কানে উপস্থিত হল। এতে অনেক বিষয়েরই দিগ্‌দর্শন আছে এবং সেটা প্রশংসা মুখেই বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদনুসন্ধানেই জীবনের সফলতা। আমরা সকলেই সুখের অনুসন্ধান করছি। সেটি সুশৃঙ্খলিত ভাবে করা হলেই ভগবানের অনুসন্ধান,—কৃষ্ণের অনুসন্ধান হয়ে যায়। পণ্ডিতগণ এবং পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ বেদান্তের 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'কেই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ বলে জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে একটু গভীরভাবে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানের কথা বলেছেন।

ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ কি ? না—সুখের স্বরূপ, রসের স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। আমরা যে যেখানে আছি সকলেই সেই সুখের কাঙ্গাল এবং সর্ব্বক্ষণ সুখই অনুসন্ধান করছি। অর্থ চাইলেও যেমন অর্থ পাওয়া যায় না, অর্থ অর্জ্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হয়, সেই প্রকার সুখ চাইলেই সুখ পাওয়া যায় না,

তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সুখের রকমারী পরিচয় আছে। শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাধিক সুখ যদি পেতে হয় তা হলে সেই প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার অনুসন্ধান করতে হবে। সেইটি পর পর জৈমিনীর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা আর ব্যাসদেবের বেদান্তের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আর শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণানুসন্ধান এই পর্য্যায়ে উপস্থিত হয়েছে। জৈমিনীর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় কার্য্যকে প্রধান বলা হয়েছে। যেহেতু সাক্ষাৎভাবেই আমরা নিজের কর্ম্মের ফল ভোগ করি। সুতরাং ভাল কর্ম্ম করলে পরে ভাল ফল পাবে। অতএব জৈমিনী বলছেন—কর্ম্মেরই উপাসনা করা, কর্ম্মেরই শরণাপন্ন হওয়া দরকার। কর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করবে। কিন্তু আরও সূক্ষ্মবিচারে দেখা গিয়েছে যে কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার কাছে নাও আসতে পরে, যদি ঈশ্বরস্বরূপ একজন প্রযোজক না থাকেন। সেটিও জৈমিনী দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। সেইটিই ক্রমশঃ পূর্ত্তিলাভ করেছে বেদান্তের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায়। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। শ্রীব্যাসদেব জ্ঞানিগণের নিকট যে বিচার উপস্থিত করেছেন, সেইগুলি বেশ সুষ্ঠুভাবে সুসজ্জিত করে যুক্তিমূলকভাবেতে প্রকাশ করেছেন বেদান্তেতে।

বেদান্তে সেই সুখ বা পরমোৎকৃষ্ট রসের সর্ব্বাধিক প্রাপ্তির বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানের সাহায্যে রস অনুসন্ধান করতে গিয়ে খানিকটা সাপ্রেষ্ট-ভাবেতে ডিল্ করতে বাধ্য হয়েছেন। কেবল ত্যাগের সাহায্যে যে সুখ, সে সুখ সম্যক্ নয়। যেমন ব্যাধির যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ করলেই

সেটা পূর্ণ স্বাস্থ্যের সুখানুভব নয়, সেইপ্রকার, কেবল নশ্বর মৃত্যুময় জগতের হাত থেকে নিষ্কৃতি বা মুক্তির দ্বারাতেই আমরা প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারি না। যেটুকু সুখানুভব হয় সেটুকু অতি সামান্য। এই জন্য ব্রহ্মেতে লীন হয়ে সুষুপ্তিবৎ সমাধিতে এক ধরণের সুখের আস্বাদনের কথা বলা হলেও সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতির সম্যক্ পরিচয় না থাকায় সেটা অব্যক্ত, অসমাপ্ত বা অপরিস্ফুট অবস্থা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই পূর্ণ-সুখ-স্বরূপ বস্তুকে আস্বাদনের জন্য বৈষ্ণবগণ একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পন্থার কথাই বলেছেন। যাতে ভোগের দ্বারা সুখ এবং ত্যাগের দ্বারা সুখ "ত্যাগাৎ শান্তিঃ" এই দুটিকে অতিক্রম করে সেবা নামক বস্তু বা ভক্তির সাহায্যে উচ্চতর বস্তুর অনুশীলন করা যায়। তাঁরা এই কথা জানিয়েছেন,—ভোগ—ত্যাগ, ত্যাগ—ত্যাগ এই দুটির যদি আমরা ধারণা করিতে পারি তবে সেবা কাকে বলে সেই জিনিষের অনুভব সম্ভব হবে।

আমাদের স্বাভাবিক যা ষ্টেটাস্, যা আমাদের স্বরূপ, তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তুর যদি সঙ্গলাভ করতে হয়, তা হলে তার অধীন হয়ে আমাদিগকে অগ্রসর হতে হবে। এটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারি। সুতরাং সেবার সাহায্যেই আমরা উচ্চতরলোকে যেতে পারি। আমাদের স্বরূপ খানিকটা ব্রহ্মলোকেতেই অবস্থিত এই প্রকার বলা হয়েছে এবং এইখানেই শেষ করা হয়েছে মুক্তিবাদিদের যা কিছু কথা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব একটা নূতন

বিচারধারার অবতারণা সুপরিস্ফুট করলেন, যা অন্যান্য শাস্ত্রেতে অপরিস্ফুট ভাবেতে ছিল। সেটি কি? না—

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

হরি নামক বস্তু, ব্রহ্মের অপর পারেতে তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর এমন মাহাত্ম্য, এমন মাধুর্য্য যে যাঁরা আত্মারাম, জড়ারাম পরিত্যাগ করে আত্মারামত্বে অবস্থিত, তাঁদের চিত্তকে অহৈতুকী ও অপ্রতিহত ভাবেতে আকর্ষণ করে থাকেন। চতুঃসন, শুকদেব গোস্বামী, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি দৃষ্টান্তে ও তাঁদের উপদেশেতে আমরা এই প্রকার জগতের সন্ধান পাই। রামানুজ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি মধ্যযুগীয় আচর্য্যগণও বেদান্তের ভাষ্যেতে সেই তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন।

সেই বেদান্তের পরমভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই সমগ্রবেদের প্রপক্ক ফল বলে ব্যাসদেব যে বর্ণনা করেছেন, সেই জিনিষটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব। "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্" শ্রীব্যাসদেব তাঁর শেষ গ্রন্থেতে সমস্ত বেদ-ইতিহাসের সার সংগ্রহ করে এক জায়গায় দিয়ে গিয়েছেন। "নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং"। সেটি বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক গলিত ফল। স্বাভাবিকভাবেতে বৃক্ষের যেটা দেয়, সেই জিনিষটি ভাগবতরূপে বেদ দিয়েছেন। গায়ত্রীর অর্থের সঙ্গে তার সমার্থকতা দেখা যায়। সেইটিই হচ্ছে আমাদের

স্বাভাবিক প্রাপ্তি বা উদ্দিষ্ট বস্তু। তা সেই জিনিষই পাওয়া দরকার এইকথা শ্রীচৈতন্যদেব বলে গিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে বাইরের ধর্ম্মজগতের নানা রকমের যে ধারণা রয়েছে, সেই সব গুলিকে দূরীভূত করে শ্রীব্যাসদেবের শেষ দান শ্রীচৈতন্যোদ্দিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিস্তার করে গিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগত প্রচারকগণ তাঁদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত্যে অদ্যাপিও সেই প্রকার চেষ্টাবিশিষ্টা সাধারণ অজ্ঞ লোকের বিচারেতে এইসব বিষয়ের বেশী মূল্য না থাকতে পারে, যেহেতু অন্নচিন্তা চমৎকার। অন্নবস্ত্রের অভাবেতেই সকল বিব্রত বোধ করছে। তাতে অনেকেই মনে করবে যে ধর্ম্মচিন্তা ও ভগবদনুশীলন বা ভগবদনুসন্ধানের সময় কোথায়? কিন্তু এ বললে তো আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। দরিদ্র ব্যক্তি হলেও যেমন তার খাওয়াতেই সব অর্থ ব্যয় করলে চলে না, তার মধ্যে কিছু অংশ চিকিৎসার, কিছু অংশ বিদ্যার্জ্জনের এবং অন্যান্য শুভকার্য্যেও ব্যয় করতে হয়, তেমনি আমাদের যা সময় হাতে আছে, তার মধ্য হতেই আমাদিগকে পরমার্থ-চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র জীবনের এবং জন্ম জন্মান্তরের সমাধান হয় যাতে সেই বিষয়ে সময় ও উদ্যম ব্যয় করতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে আমরা ঠক্‌ব।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিং নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন, — আমরা তো অতি ক্ষুদ্র। আমাদের আর কতটুকুই বা পুঁজি, স্বয়ং ব্রহ্মা যিনি এই সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি পর্য্যন্ত অমঙ্গলের অধীন। কেন ? — যেহেতু কর্ম্মার্জ্জিত বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীল। এই ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি এত বড় একটা প্রকাণ্ড অধিকার পেয়েছেন, তথাপি তাঁর জীবনটাও এই নশ্বর বস্তুর আপেক্ষিকতায় বর্ত্তমান। এই জন্য তাঁর স্থান পর্য্যন্ত এই ত্রিতাপ পৌঁছে গিয়েছে। সেখানেও অমঙ্গল। ব্রহ্মাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁকেও মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করতে হয়।

অতএব আমরা যদি মৃত্যুঞ্জয় হতে চাই তাহলে এই শিক্ষাই আমাদিগকে অবলম্বন করে চলতে হবে। কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ, ধর্ম্ম এবং কাম, এর পরিণাম বুঝে এর অতীত প্রদেশের সম্পত্তি অর্জ্জনে চেষ্টিত হতে হবে। আসলে সেইটিই আমাদের সকলের কমন্ চেষ্টা হওয়া উচিত। আমরা মূর্খ হতে পারি, বিদ্বান হতে পারি, দরিদ্র হতে পারি, ধনী হতে পারি, যে কোন অবস্থাতেই থাকি না কেন আমাদের সব সময়েই মূল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

শাস্ত্রেতে পুনঃ পুনঃ বলেছেন — এই মনুষ্যজন্ম পেয়ে যদি আমরা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে না পারি তবে আমরা প্রকৃতই আত্মঘাতী।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভঃস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

শাস্ত্রের বহু স্থানেতেই এই কথা বলা হয়েছে। যদি তোমার এই দুর্ল্লভ জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করতে না পার, তবে জেনো যে তুমি নিজেকে হত্যা করছ। তুমি যেসব কাজেতে এখন নিযুক্ত আছ, এসব কাজ যে কোন জায়গায় হবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ — যেখানে যাবে জন্ম হবে। সর্ব্বত্রই এই বিষয়ে রসের আস্বাদন পাবে। বরং মনুষ্য জন্মের চেয়ে আরও ভালভাবেও পেতে পার। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিচালনের যোগ্যতা অনেক জন্মেরই বেশী আছে। চক্ষুর দৃষ্টি অনেক পক্ষীর বেশী আছে। এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ে অধিকার রসাস্বাদন সম্ভাবনা অন্যত্র রয়েছে, কিন্তু মনুষ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কর। নিজের অনুসন্ধান কর। আমি কে ? আমি কোথায় ? আমার কিসে মঙ্গল হয়। যেমন যারা ডোগ্‌লা জাতীয় তারা উপস্থিত ভাবনা করে 'আজ কি খাব ?' কিন্তু যাঁরা একটু বিচক্ষণ, তারা ভবিষ্যতের চিন্তা করে। তারা ভাবে কাল কি খাব ? সেই প্রকার যাঁরা হুঁসিয়ার ব্যক্তি — তাঁরা কাল, পরশ্ব তৎপরশ্ব প্রভৃতির চিন্তা করে থাকেন। আর সাধুগণ উপস্থিত যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থেকে ভবিষ্যতের — জন্ম-জন্মান্তরের জন্য চিন্তা করেন। আমরা সকলেই জানি — এজ্ সিওর্ এজ্ ডেথ্ — মৃত্যুর চেয়ে এজগতে নিশ্চিত আর কিছু নয়।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরম্।
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

যুধিষ্ঠির মহারাজের এই প্রকার আশ্চর্য্যের সম্বন্ধে যে ধারণা এবং তিনি যা বলেছিলেন, সেটা আমাদের অনেকেরই বিদিত। কিন্তু সে বিষয়েতে আমরা অনবধানযুক্ত অবশ্যম্ভাবী জিনিষ যেটা আসবে আমরা সে বিষয়ের প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করছি না এইটাই আশ্চর্য্য। অতএব আমরা নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। নিজের ইন্টারেষ্ট নিজে নষ্ট করছি। অতএব এই অবস্থার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। এই অবস্থায় কেবল সাধুগণ আসেন আমাদের দ্বারে। আমাদের দ্বারা তিরষ্কৃত, লাঞ্ছিত এবং অনেক প্রকারে অপমানিত হয়েও বা দুর্ব্যবহার পেয়েও তাঁরা উপযুক্ত অভিভাবকের মত আমাদের মঙ্গলচিন্তাই করে থাকেন। আমাদের স্বরূপোদ্বোধনের যত্ন করে থাকেন। আত্মজ্ঞান প্রদান করে থাকেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

ভাগবত বলেছেন—যাঁরা সেই ভগবানের কথামৃত দান করেন, তাঁরাই প্রকৃত দাতা। তাঁরাই 'ভূরিদা'। ভূরি মানে প্রচুর। প্রচুর পরিমাণে দান কে করে? আমরা মনে করি,—

অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান প্রভৃতি দানই খুব বড় দান। কিন্তু তা নয়। সর্ব্বশ্রেষ্ট দান হচ্ছে ভগবানকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। তা কি করে পাওয়া যায়? না—সাধুগুরুর আনুগত্যে ভগবচ্চরণে শরণাগত হলেই তা পাওয়া যায়। তিনি শরণাগতকে রক্ষা করেন। তিনি সব জায়গাতেই আছেন। তাঁর নাম আশ্রয় করে ডাক্‌বার যে সহজ পন্থা সেইটি গুরুরূপী ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হতে প্রকাশ করে দিয়ে সকলকে ব্যাপকভাবে জানিয়ে দিলেন। একদিক দিয়ে অত্যন্ত সহজ কিন্তু চরম আন্তরিকতার প্রয়োজন। ফাঁকি দিলেই ফাঁকে পড়তে হবে। আন্তরিকভাবে সেই ভগবানের নাম গ্রহণের দ্বারাই আমরা সর্ব্বস্বার্থ লাভ করতে পারি।

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥"
"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥"

যাঁরা সারগ্রাহী, তাঁরা কলিকাল কবে আসছে বলে অপেক্ষা করে থাকেন; যেহেতু ঐ সময় যদি জন্ম গ্রহণ করতে পারি তো হরিনামরূপী ভগবানের কৃপাবলে আমি বহু উচ্চ অবস্থায় চলে যেতে পারবো। খুব সহজ পন্থায় চরম জিনিষ—ব্রজরস পাবার সৌভাগ্যলাভ করবো।

আমরা আজ এই গৌরমণ্ডলের মধ্যে এইস্থানে উপস্থিত আছি। এখানে আমাদের সুযোগ আছে। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের এবং ভগবান বেদব্যাসের (যিনি শাস্ত্রদাতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের সমস্ত লেখকদের মধ্যে যাঁর স্থান সর্ব্বোচ্চে আধুনিক সাহিত্যিকগণও সেটা স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবীতে যাঁর দ্বিতীয় নাই সেই ব্যাসদেবের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আমাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত রূপে প্রকাশিত। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি কি দিয়েছেন ? যা তিনি অন্যান্য জায়গায় দিতে পারেন নাই, সেইবস্তু দিয়েছেন। তাঁর গুরু নারদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে তিনি সমস্ত শাস্ত্রের একটা রি-এড্জাষ্ট্মেন্ট দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রকাশ করে গিয়েছেন। রস কি বস্তু, আনন্দ কি বস্তু, সুখ কি বস্তু, তার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। মুক্তগণের অনুশীলনের বস্তু দিয়ে গিয়েছেন। রোগীর পথ্য তো অন্যান্য শাস্ত্রেই দেওয়া আছে। কিন্তু সুস্থ রোগমুক্ত ব্যক্তির কি খাদ্য, কি অনুশীলন করবেন, কি আস্বাদন করবেন, কি নিয়ে দিন কাটাবেন,— সেই কৃষ্ণলীলা—ভগবৎলীলার কথা বলে গিয়েছেন। আর সেইটি জন্মযোগী, জন্মত্যাগী,—ত্যাগেতে যাঁর সিদ্ধি অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত— সেই শুকদেবকে বেছে নিয়ে তাঁরই মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়দথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

'হৃদ্-রোগম্' অর্থাৎ আমরা সকলেই যে হার্টডিজিজ্ এ সাফার্ করছি। হৃদ-রোগটা কি ? না—কাম। কাম অর্থাৎ বাসনা। সহস্র সহস্র কামনা—বাসনা।

"সহস্রমিচ্ছতি সতি সহস্রীং লক্ষমীয়তে।
লক্ষাধিপস্ততো রাজ্যং রাজ্যস্তৎ স্বর্গমীয়তে॥"

আমরা যতই পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। আরও চাই আরও চাই করি। এইটিই হোল হৃদ্রোগ। এর চিকিৎসা কি ? না সব ভগবানেতে অর্পণ। অর্থাৎ সব ভগবানের। আমার কিছু নয়। আমিও তাঁরই। এই কন্সেপ্সনেতে আমরা যদি নিজেকে এড্জাষ্ট করতে পারি। তা হলেই আমরা প্রকৃত মুক্তি লাভ করবো।

ভাগবতের সংস্কৃতি—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ॥"

ভাগবতের মুক্তির স্বরূপের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাতে পজেটিভ্— কেবল ডেষ্ট্রাক্টিভ্ নয়—কনষ্ট্রাক্টিভ্ বস্তু প্রদান করা হয়েছে। এজগতে আমরা যে রস আস্বাদন করছি—ড্র করছি—এর ঠিক্ পজেটিভ্ জগৎ একটা রয়েছে। এটা সেই

মূল জগতের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ সেই জগতের সঙ্গে। সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেখানকার রস আহরণ করা প্রয়োজন। ভোগবুদ্ধিই এই অলীক জগতে বসবাসের কারণ। যেমন যদি অপরের সম্পত্তি জাল দলিলের দ্বারা নিয়ে আমি ভোগ করি, তা হলে চরমে দাগা পেতে হয়, সেই প্রকার একটা ভুল ধারণার উপরেতে যে আমাদের অধিকার স্থাপন করে আমরা তা হতে সুখ পেতে চাচ্ছি, সেটা সবই মায়া। মায়া—মা যা; সেটা যা নয় তাকে তাই মনে করে সেখান থেকে আশা ভরসার ধোকা পাওয়া। সত্যিকারের আমি যা, সেই স্থানেতে অবস্থিত হয়ে—যে সুখ আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই স্বরূপের সম্পত্তি—সেই সুখ বা রসের জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। সেই রস হচ্ছে ভগবদ্রস। কৃষ্ণলীলারস। কৃষ্ণের লীলা দেখে তাতে নিজের সুখ অনুভব করা। কর্ম্মের মুক্তি তো বটেই, 'ভক্তি সহিত-নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্'। সেবার সঙ্গে নিষ্কাম। কেবল ত্যাগ নয়। মূল পজেটিভ্ জিনিষ রয়েছে তাতে,—শ্রীভগবৎসেবা। ভগবান রসস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ—তিনি আনন্দস্বরূপ। সুতরাং আমাদের জ্ঞানবৃত্তির চরিতার্থতা সেখানে মিলবে এবং আমাদের সর্ব্বোপরি যে সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি, রসাস্বাদনপর আকাঙ্খা—সেটা তাঁর সান্নিধ্যে সুষ্ঠু চরিতার্থতা লাভ করবে। সুতরাং এই বিষয়ে যে চেষ্ঠা সেইটিই হোল পজেটিভ্ লাইন্। তদ্ব্যতীত অন্যান্য যা কিছু এন্‌গেজ্‌মেন্ট্ সবই বিপদসঙ্কুল—স্বার্থহানিকর। সব সময়ে উল্টাদিকে

আকর্ষণ করে আমাদের বাস্তব সম্ভাবনা হতে আমাদিগকে বঞ্চিত করছে। সাধু সাবধান ! আমরা সকলেই নিজেকে সাহায্য করতে চাই আন্তরিকভাবে—এতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এমন পারিপার্শ্বিকতার প্রলোভনের চাপে আমরা পড়েছি যে আমাদের সে কাজটা আমরা করতে পারছি না। যেমন নাবালক মালিক দুষ্ট কর্ম্মচারিদের পাকে পড়ে সুবিধা করতে পারে না, সেই প্রকার একটু যাদের কাণ্ডজ্ঞান মুকুলিত হয়েছে, সেইরূপ বদ্ধজীবের চেষ্টাটাও অনেকটা এই প্রকার অসুবিধাগ্রস্ত। তাদের আত্মার কর্ম্মচারীরূপী যে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রয়েছে তারা আত্মাকে দাবিয়ে রেখে নিজেরা প্রভু হয়ে সেই আত্মার স্বার্থহানি করছে। সেই জন্য অন্য আর একজন সৎ মেজর্ প্রপ্রাইটারের সঙ্গে এই মাইনর্ প্রপ্রাইটারের যদি একটা যোগযোগ হয়, তা হলেই তার প্রকৃত ইন্টারেষ্ট সংরক্ষিত হতে পারে। সেই প্রকার যে সমস্ত মায়িকজ্ঞান আমাদিগকে বঞ্চনা করছে, আমাদেরই ভেতরে বাস করে আমাদের রক্ত খেয়ে আমাদের অনিষ্ট করছে, এমন যে সব ... আইডিয়াস্—সেই গুলোক সাধুর কাছ থেকে বল লাভ করে দাবিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপণীয়মানা
স্তেঽপি স্বতন্ত্রামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ ॥

স্বার্থের গতি হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম। য এদং বিশ্বং ব্যাপ্নোতি। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত তত্ত্ব হচ্ছেন বিষ্ণু। তাঁর পাদপদ্ম ছাড়া আর যা কিছু অনিত্য বস্তু সমস্তই আমাদের স্বার্থহানিকর ।আমি ৪২ বৎসর আগে এখানে যে প্যারাফ্যার্‌নেলিয়া দেখেছিলাম তার কতটুকু অংশ এখন অবশিষ্ট আছে ? যেটা রয়েছে সেটাও অনেক বিকৃত এবং সে সব লোক 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' এই সম্পত্তি, এই গ্রাম এবং এখানকা র ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের যাঁরা মাষ্টার, এই সমস্ত সমাজ ও মনুষ্যদের নিয়ে খেলা করতেন—আজ তাঁরা কোথায় ? তাঁদের প্রায় সকলকেই আজ দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আরও কিছুদিন পরে বা যে কোন সময় আমরাও ঐ অবস্থায় যাব, আবার নূতন সেট্ আসবে, অতএব এই প্রকার যে কালপ্রবাহ চলছে আমরা কোথায় তার স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছি। অতএব এর একটা কূল পাওয়া দরকার এবং সেটা অবুঝের কাজ নয়। প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। গীতায় ভগবান বলেছেন,—

'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্'

জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি এর মধ্যে যে দুঃখ আছে এই জিনিষটা যারা অনুভব করে, তাদের বুদ্ধিই প্রকৃত সাত্বিক বুদ্ধি—শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। যেমন ভাল রাডার্—এতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জিনিষও ধরা পড়ে, তেমনি তাঁদের ফাইন্ ইন্‌টেলক্‌টেতেও

প্রকৃতির এই খেলা ধরা পড়ে যায় এবং তার প্রতিকারও তাঁরা করতে চেষ্টা করেন।

সুতরাং এই পারিপার্শ্বিকতাই নিত্য নয়। এর অনুভব কর্ত্তা যে আত্মা সেই আত্মাই নিত্য বস্তু। সেই নিত্যবস্তুরও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা আছে। ব্যাক্ টু গড্ ব্যাক্ টু হোম্—প্রকৃতপক্ষে আত্মা—চেতনের প্রকৃত ঘর বাড়ী সেই চিন্ময়লোকে।

গুরুপাদপদ্মে রহে যাঁর নিষ্ঠা ভক্তি।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥

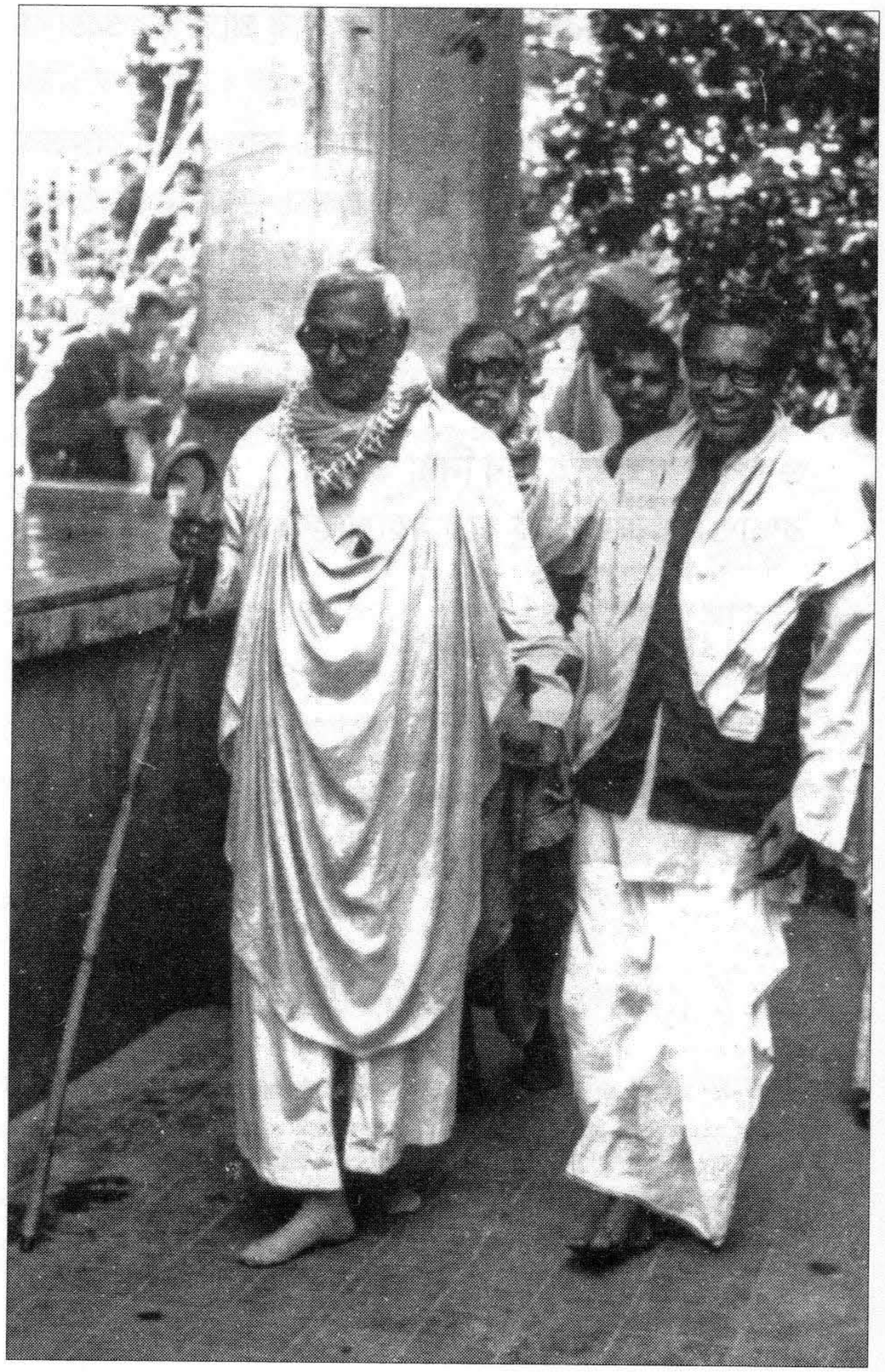

ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতি।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তয়ো
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(ভাঃ ১১/২/৩৭)

আমাদের ভয় এটা হচ্ছে দ্বিতীয়াভিনিবেশের জন্য, separate interest ই হচ্ছে আমাদের বিপদ সুতরাং Back to God Back to Home; কেননা একটা পাগলের যেমন সবই আছে, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, সহায়-সম্পদ কিন্তু মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে, রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে খানকতক কাগজ হাতে দিলেই তো তার সেবা করা হবে না, তার ব্রেইনটার যে এলোমেলোভাব সেইটাকে ঠিক করতে হবে। সেই রকম আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে God conscious অর্থাৎ ঈশ্বর চেতনা থেকে দূরে সরে আসার জন্য যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থৎ ঈশ্বর সম্পর্ক হীন অন্য কিছু খুঁজতে এসে এই land of misconception এখানে নিয়ে এসেছে,

আর এখানে মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটছে। মায়া মানে 'মৃয়তে অনয়া', আর 'মা-যা' অর্থাৎ যাহা নয়। রবিঠাকুরের বিসর্জন নাটকে তিনি বলছেন মহামায়া মানে মহামিথ্যা, এই মহামিথ্যার পাল্লায় পড়ে এই misconception, separate interest আমাদেরকে ঘোরাচ্ছে। এখন এসব থেকে বেরুনোর উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

(গীতা)

যজ্ঞ মানে ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি সাধক কর্মই হচ্ছে যজ্ঞ। Action Reaction অর্থাৎ আমি আজ যাকে খাচ্ছি সে একদিন আমাকে খাবে এভাবে চলতে থাকবে আর এ হোতে বেরুনো অত্যন্ত কঠিন, কেবল ঐ কৌশল দিয়ে বেরুতে হবে, 'যোগ কর্মসুকৌশলম্।' যোগ কি ? সমস্ত কামনা বাসনা বিসর্জন দাও, লাভ লোকসান, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ সব বিসর্জন দিয়ে infinite -এর সঙ্গে কানেকশন্ কর। সেই প্লেনে যে ওয়েভ চলছে সেই ওয়েভের সঙ্গে তুমি হারমনিতে এস, এটি বাঁচবার বাঁচাবার শুধু নয়, এহল প্রকৃত সমৃদ্ধময় জীবন।

Land of dedication সেটা, সেখানে প্রত্যেকটা ইউনিট শুধু দেয়, নেয় না। ব্যাংকে টাকা জমা করে চেক কাটেনা। অর্থাৎ পরমেশ্বরকে শুধু সেবা করে যাওয়া বিনিময়ে কিছুর প্রত্যাশা নয়। এখানে exploitation করে বাঁচা মানেই একে

অপরকে খাওয়া, আর সেখানে প্রত্যেকে কেবল নিজেকে দেয়। সেবা করে সেখানে আনন্দ পাওয়া যায়। চন্দন ঘষলেই যেমন অতি সুন্দর সৌরভ উঠে তেমনি প্রত্যেকে সেবা করছে বলে সেখানে হলাহলের পরিবর্তে অমৃত উত্থিত হচ্ছে। সুতরাং, এই আত্মদান সেটার আবার দুই স্তর। প্রথম স্তরে বৈকুণ্ঠতে সেটা constitutional, আইন মেনে চলা, শাস্ত্র মেনে চলা আর উপরে সেটা continious—অটোমেটিক love of labour, সেখানে প্রত্যেকে নিজেকে বিতরণ করছে। এই হলো গোলক-বৃন্দাবনের পরিচয়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তিনিই হচ্ছেন Reality the Beautiful, আর এই জগত শাসন করবার মূল কারণ হচ্ছে প্রীতি, সৌন্দর্য্য—সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্, সৎ-চিৎ-আনন্দ, তিনিই প্রাইম কজ, তিনিই শাসন করছেন। এই সবই হচ্ছে মহা প্রভুর চিন্তাধারা। এখন সেখানে যাওয়া যেতে পারা যায় যদি সেইরকম যোগাযোগ করা যায়, মহাপ্রভু বলছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাঁহা বিস্তারিত হইয়া ধরে প্রেম ফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥
প্রেমফল 'পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১-১৬৩)

এখন গৌড়ীয় সম্প্রদায় কি প্রচার করে ? একটা হচ্ ফচ্ পাঁচ মিশুলি খিচুড়ি পাকিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া, এই প্রকারের নয়, সূক্ষ্ম বিচার, শাস্ত্রের চুল-চেরা বিচার করে গোস্বামীগণ দেখিয়ে গেছেন, মহাপ্রভুর প্রেরণা অনুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী দেখিয়ে গেছেন। আর গৌড়ীয় মঠ মানে Comparative study of Theology।

প্রশ্ন ঃ যে গোলকের কথা বলা হচ্ছে সেখানে কি ভাবে যাওয়া যেতে পারে ?

গুরুমহারাজ ঃ হাঁ, সেখানে যাবার উপায় আছে, আদৌ শ্রদ্ধা এই লাইনে যেতে হবে। শ্রদ্ধা কাকে বলে ? 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় / কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়।' এই ধরনের একটা সেন্ট্রাল ট্রুথ আছে—

যস্মিন জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবিত॥

যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, সাধারণ লোক বলবে এটা পাগলামি বা বোকামীর কথা কিন্তু এইটাই আসল কথা, ভাগবতে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতেজ্যা॥

—যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠরূপে জল সেচন করলেই উহার স্কন্ধ শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। গীতাতে ভগবান বলছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥

তার justification কি ? আমার মনে আছে ছেলে বেলায় যখন ঝোক ছিল সাধু হয়ে যাব তখন গীতা পড়তে গিয়ে— শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

এই জায়গায় ঘাবড়ে যেতাম যে বেশী বাড়াবাড়ি করব না—পরধর্ম্ম ভয়াবহ। কিন্তু যখন আবার 'সর্ব্বধর্মান

পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই শ্লোকের চিন্তা করতাম তখন গায়ে বল হয়ে যেত।

একটা কনষ্টিটিউশানেল মেথড্ আর একটা বৈপ্লবিক মেথড্। 'সর্ব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এর জাষ্টিফিকেশন হচ্ছে, যে যেখানে আছ সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে আমার দিকে এগোও, আমি রক্ষা করব চিন্তা নেই। এরকম আশ্বাসবাণীর ঘোষণা দিচ্ছেন, যেখানে যে পজিসনে আছ সব ছেড়ে Absolute Call এ সাড়া দাও। তখন Relative Call—এর কোন দাম থাকে না। দেশে যখন যুদ্ধ বাধে তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেওয়া হয়, তখন গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় তখন সাধারণের সম্পত্তি গভর্ণমেন্টের অধিকারে এসে যায়। সুতরাং Absolute Call মানেই যে যেখানে যে পজিসনে আছ আমার দিকে এগোও আমি দেখব।

সুতরাং শ্রদ্ধা, ভক্তি এসব থাকা চাই। ভক্তি জন্মে কোথা হতে, 'ভক্তিস্তু ভগবৎ ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে, ভক্তি জন্মে ভক্তের সঙ্গে। 'কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ', দীপ থেকে যেমন দীপের জন্ম তেমনি সাধুর ভেতর যে ফ্লেম ঐ ফ্লেম জ্বালিয়ে নাও তোমার হৃদয়েতে। আর সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় কি করে ? সুকৃতির দ্বারা। সুকৃতি দুই প্রকার, জ্ঞাত সুকৃতি আর অজ্ঞাত সুকৃতি হয়। সেটা জেনেও হতে পারে না জেনেও হতে পারে। আমার অজানা অবস্থায় হলে অজ্ঞাত সুকৃতি। তারপর শ্রদ্ধা faith ভেতরে এসে যায়। শ্রদ্ধা বা faith এবং

সেটি প্রকৃত faith হওয়া চাই। প্রকৃত faith তাকে শ্রদ্ধা বলে। 'শ্রদ্ধাময়োং লোক' উপনিষদে এই কথা বলেছেন। যেমন কান থাকলে শব্দ জগৎ আছে। চোখ থাকলে রূপ জগৎ আছে তেমনি শ্রদ্ধা থাকলে ঐ ভগবৎ-ধাম আছে। শ্রদ্ধার সাহায্যে সেই লোকটাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায় 'বিশ্বপূর্ণ সুখায়তে'।

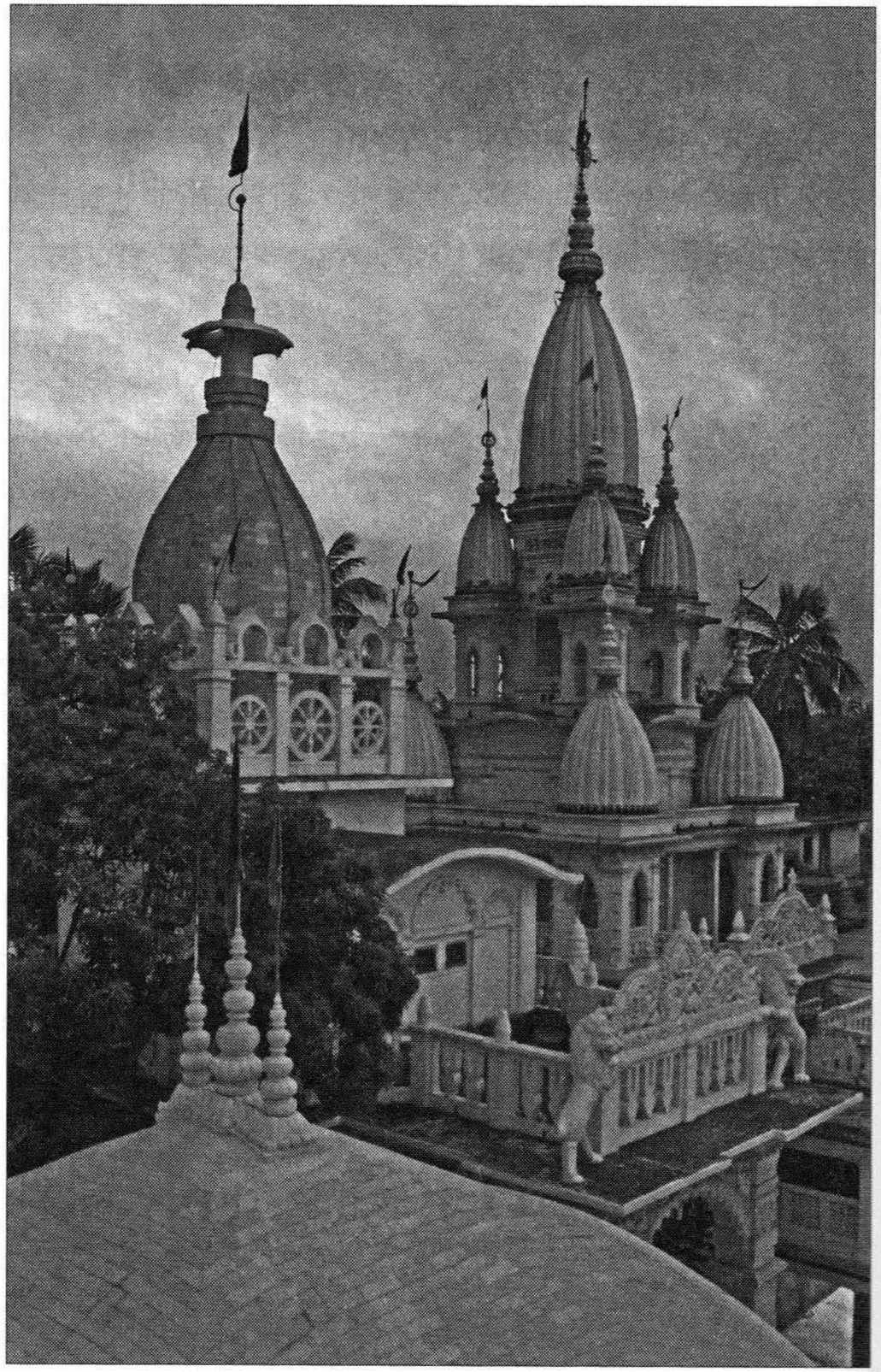

আগুন জ্বালো, বাতাস আপনি আসবে

আগুন জ্বালো, বাতাস আপনি আসবে। স্বয়ম্ অসিদ্ধঃ কথম্ অন্যান্ সাধয়েৎ—এর চেয়ে অনেক বড় কথা হ'ল "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।"

যাঁরা গোষ্ঠ্যানন্দী সাধক, তাঁদের 'আমার ভাল মন্দ কি কতটা হ'ল, সে দিকে খেয়াল নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এসিওরেন্স বাণী। এই আদেশের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ও অপরের মঙ্গল দেখে থাকেন। তুমি সাধক সিদ্ধ না হয়েও তুমি কৃষ্ণনাম প্রচার কর। এই আদেশের মধ্যেই মহাপ্রভু সাধকের প্রচারের অধিকার দিয়েছেন। শ্রীযাযাবর মহারাজের সন্ন্যাসের সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—ভয় করছে? ভয় কি? অভয় পদে শরণ নিতে যাচ্ছ। 'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আত্মহুতিই আমাদের সকলের সকলের একমাত্র রক্ষার উপায়। আমরা যে জিনিষের অনুশীলন করছি, তাতে বিষয়ীর বিষয় রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সর্ব্ববিধ রোগ সেরে যায়। ডাইটু

লিভ্ ! বাঁচার অধিকার আমাদের সহজাত এবং বাঁচার মতই বাঁচতে হবে। সংকীর্ত্তনাগ্নিই আমাদের সত্তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। "ভস্মী ভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ।" যদি সত্যিকারের কৃষ্ণ কীর্ত্তন কর, তা'হলে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না। পারমার্থিক আগুনের প্রয়োজন। নিজের কল্যাণ ও জীবকল্যাণের জন্য "আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।" শ্রোতাই তোমার সংকীর্ত্তনাগ্নিতে ইন্ধন দেবে। একবার শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ভিক্ষা করতে গিয়ে এক পতিতালয়ে উঠে পড়েছিলেন। প্রভুপাদ তাই শুনে হরিকথা বলতে বলতে বলেছিলেন "আমি কি তাহলে ভুল করছি ? যারা বিষয়কে মলবৎ পরিত্যাগ ক'রে বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, সেই সব ছেলেদের আবার বিষয়ীর দ্বারে দ্বারে পাঠাচ্ছি— কেন পাঠাচ্ছি ? আমি ভুল করি নাই। এই প্রসঙ্গে হরিদ্বারের দুই সাধুর গল্প বলেছিলেন। দু'জন সাধু দেখলেন, গঙ্গা জলে একটা কাল কম্বল ভেসে যাচ্ছে। তাই দেখে সেটা আনার জন্য একজন গিয়ে সেই কম্বলে হাত দিয়ে যেই তুলতে গেছে, কম্বলটা অমনি তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আসলে সেটা ছিল ভালুক। সে ভেসে যেতে যেতে আশ্রয় মনে করে সাধুকেই জড়িয়ে ধরেছে। অপর সাধুটি দেখলেন যে ও কম্বল নিয়ে উঠছে না। তখন বললেন "আরে ভেইয়া কমলিকো ছোড় দে, চলা আও"। সে তখন বলছে "ভাইয়া হামতো কমলিকো ছোড় দেতা লেকিন কমলি হামকো ছোড়তা নেহি।" সেই প্রকার বিষয় হতে দূরে থাকতে গেলেও

বিষয় তোমাকে ছেড়ে দেবে না। তার সঙ্গে এতদিন যে মাখা মাখি ক'রে এলে, আজ তাকে তুমি কেউ নয় বললেই সে ছেড়ে দেবে কেন ? কোটি কোটি জন্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। সে তোমার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ ক'রে তোমার তুমিত্বকে বেদখল করে দিয়েছে। সুতরাং তাকে ছাড় বললেই সে ছাড়বে না। এটা অতি সত্য কথা। সুতরাং তাকে সরাতে গেলে তোমাকেও সেই প্রকার প্রকৃষ্ট উপায় গ্রহণ করতে হবে। "ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধেরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।" তোমার মন, তোমার বুদ্ধি, তোমার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ঘাঁটিগুলি সে বেদখল করে রেখেছে, সেই হেতু তারই বল হবে বেশী। অথচ তোমার কাজই হচ্ছে সেগুলি উদ্ধার করা। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-ই হচ্ছে তোমার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

"তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্॥"

বিদ্রোহ যখন ঘোষণা করেছ, তখন প্রত্যাঘাতের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। মেহনত করতে হবে। কামাদীনাং শ্লোকে তার পরিচয় রয়েছে। অতএব বিষয়কে পিছনে ঠেলে দিলেই সে যাবে না। যুক্ত বৈরাগ্যই হচ্ছে বিষয় ত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায়। 'নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে" না হলে হবে না। প্রভুপাদের গৌড়ীয়ের শিরোনামায় তাঁর নিজের লেখা এই বাংলা পয়ার দুটি থাকতো—

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।
আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব॥

এই হলো প্রভুপাদের ফর্ম্মুলা।

পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি কর। 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।' 'কভু না বাধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।' মরিয়া হ'য়ে যাও। টোটালেটেরিএন্ ওয়ার্। যে, যে অবস্থায় আছ, জেনো এইটাই বাঁচার একমাত্র পথ। শ্রীমহাপ্রভু বলছেন, ভেবো না যে আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাক্‌বো। 'পুনরপি' এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ।' তুমি সৈনিক। তোমার সবটুকু দায়িত্বই আমাকে বহন করতে হচ্ছে। এই কাজের মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।

মা মুঞ্চ-পঞ্চ-দশকম্

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিতম

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
পতিতং ঘোর-সংসারে হ্যবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥১॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। মায়ার কবলে কবলিত হয়ে ঘোর সংসার গহ্বরে পতিত।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
অনাদি-ভাগ্য-বৈগুণ্যাৎ ভোগমুগ্ধং দুরাশয়ম্॥২॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। অনাদিভাগ্য বৈগুণ্য জন্য দুরাশয় দুষ্টু অভিপ্রায় ইচ্ছা বাসনায় মোহমুগ্ধ।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
মায়া-ক্রীড়নকং দীনং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ম্॥৩॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। মায়ার ক্রীড়নক দীন, দরিদ্র, দুঃখিত দুর্গত নিরালম্ব নিরাশ্রয়।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভীতি-চিন্তাতি-কাতরম্॥৪॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভীতিতে চিন্তার্ত্ত কাতর।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
জ্ঞানাজ্ঞান-কৃতানন্ত-পাপ-ভোগ-ভয়াকূলম্॥৫॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত কাজের পরিণামে অনন্ত পাপ ভোগ ভয়ে আকুল।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
কাম-ক্রোধাদি-দস্যুভির্নির্দ্দয়ং পদমর্দ্দিতম্॥৬॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। কাম ক্রোধাদি দস্যুর নির্দ্দয় পদমর্দ্দিত।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
অন্তঃশত্রু-বিপর্য্যস্তং পুনঃ পুনর্বিলাঞ্ছিতম্॥৭॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। অন্তঃশত্রু দ্বারা বিপর্যস্ত পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
ত্রাণার্থং প্রার্থ্যমানোঽপি ন মাং পশ্যতি কশ্চনঃ॥৮॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেও কেউ আমায় দেখছে না।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
পিতরো বান্ধবা দেবা অসমর্থাঃ পরাঙ্মুখাঃ॥৯॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। পিতা বান্ধবগণ দেবতাগণ অসমর্থ পরাম্মুখ।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
স্ব-পর-ভরসা-হীনং নিরুপায়ং নিরাকৃতম্॥১০॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। নিজের ও পরের উপর ভরসা শূন্য নিরুপায় নিরাকৃত।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
মহাপরাধ-রাশিনামালয়ং ত্যক্ত-সাধনম্॥১১॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। মহাপরাধ রাশির ঘরে সাধনা ত্যাগ করে ঢুকে রয়েছি।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব!
হে সদসদবিচারোর্দ্ধ-প্রপন্নার্ত্তিহরো হরে!॥১২॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। হে সদ্ অসদ্ বিচারের উর্দ্ধে শরণাগতদের আর্ত্তি হরণকারী হরি !

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব !
দাসত্বং দেহি দাসানাং তব দেব দয়ানিধে ! ॥১৩॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। হে দেব দয়ানিধি! দয়াসাগর! দাসগণকে আপনার দাসত্ব প্রদান করুন।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব !
নিযুঙ্ক্ষ্ব নিত্যদাস্যে মাং প্রদায় প্রেম-বর্ত্তনম্ ॥১৪॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। প্রেম স্থিতিতে উন্নতি করে নিত্যদাসত্বে আমাদের নিযুক্ত করুন।

মা মুঞ্চ মুঞ্চ মাং কৃষ্ণ! দাসং দীন-দয়ার্ণব !
স্বান্তরঙ্গ-সেবং দেহি হে গোপীজনবল্লভ ! ॥১৫॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। হে গোপীজনবল্লভ নিজ অন্তরঙ্গ সেবা প্রদান করুন।

মা মুঞ্চ-পঞ্চ-দশকং ! কৃষ্ণ দীন-দয়ার্ণব !
ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরোদ্গীতং গৃহানেদং স্তবামৃতম্ ॥১৬॥

আমাকে পরিত্যাগ কর না, এই দাসের পরিত্রাণ কর কৃষ্ণ। দীনের প্রতি আপনি দয়া সমুদ্র। ত্রিদণ্ডী শ্রীধর কীর্ত্তিত এই স্তবমালা গ্রহণ করুন।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

— ঃ সর্ব্ব-প্রধান-কেন্দ্রঃ —

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন - ৯৪৭৪৭৪৪০২০ • ৯৭৭৫১৭৮৫৪৬
SCSMath.com • GaudiyaDarshan.com/Bengali
math@scsmath.com

ভারতীয় কেন্দ্রসমূহ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা- ৭০০ ০৫৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগণা
এয়ারপোর্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৫২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী,
পুরী, উড়িষ্যা, পিন নং- ৭৫২০০১
ফোন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ, পিন নং- ২৮১১২১,
ফোন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিসা, পোঃ- গোবর্দ্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ, পিন নং- ২৮১৫০২,
ফোন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম)
গ্রাম ও পোঃ- বীরচন্দ্রপুর,
জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ,

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫ নেতাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- নাদনঘাট,
জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, পোঃ- মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার (মহিলা আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর, পোঃ- কালনা,
জেলা-বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ- হাপানিয়া,
জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- খাঁপুর,
জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়া, পোঃ- কান্দী,
জেলা- মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফুলডুবি, পোঃ-সাগর,
জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ,
ফোন- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- ইসলামপুর,
জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ- দিনহাটা,
জেলা- কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্
অমৃতবোদ্যা
শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শরণাগতি
শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ